সোনার-তরী সিরিজ

প্রদীপ ও অন্ধকার

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

উদয়াচল কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ও
তুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ২৩নং ডিকসন লেন হইতে প্রকাশিত
এবং মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত।

দাম এক টাকা

১৩৫১ সাল

প্রাপ্তিস্থান—
বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস
৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমতী ইরা দেবী

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়

করকমলেষু

আপনাদের সঙ্গে দূর-সম্পর্কের কুটুম্বিতার বন্ধন আছে। এবং সেইসঙ্গে আছে তারও চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধন। এই সুমিষ্ট বন্ধনটিকে স্মরণ ক'রে এই ছোট বইখানি তুলে দিলুম আপনাদেরই হাতে। ইতি --

ভবদীয়

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম

অথ পঞ্চম-বাহিনী-সন্দেশ

নর-নারায়ণের নাম শুনেছেন? পৌরাণিক নর-নারায়ণ নয়, বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক নর-নারায়ণ।

নরেন্দ্র মজুমদার ও নারায়ণ চৌধুরী, দুই বন্ধুর নাম। তাদের মতন একজোড়া বন্ধু সচরাচর দেখা যায় না। দুটিতে যেন মাণিকজোড়! যেখানে তাদের একজনকে দেখা যাবে না, সেখানে দেখা যাবে না তাদের আর একজনকেও। যেন যাঁহা বাহান্নো তাঁহা তিপ্পান্নো থাকবেই। যেখানে নরেন্দ্র আছে, ধ'রে নিতে হবে সেখানে আছে নারায়ণও। তাই লোকে তাদের নাম দিয়েছে নর-নারায়ণ।

নর-নারায়ণের নাম এমন সুপরিচিত হয়েছে কেন জানেন? অপরাধ-তত্ত্বে তাদের মতন বিশেষজ্ঞ বাংলা দেশে খুবই কম আছে। লোকে তাদের ডিটেক্‌টিভ্ ব'লেই মনে করে। আমরাও তাদের ডিটেক্‌টিভ বলেই মনে করতে পারি, কিন্তু

আসলে তারা সাধারণ 'ডিটেক্‌টিভ' নয়। তারা পুলিস-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা কাজ করে স্বাধীন ভাবেই। এ-শ্রেণীর গোয়েন্দাদের সাধারণ পুলিস কোনদিনই সুনজরে দেখে না, এ-কথা সকলেই জানে। কিন্তু নর-নারায়ণের—বিশেষ করে নরেন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, কোন গোলমেলে মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে পুলিসের বড় বড় কর্ত্তারাও নরেন্দ্রের কাছে এসে পরামর্শ করতে লজ্জিত হন না। যে কোন কঠিন সূত্রের অতি জটিল জোট্ খুলতে নরেন্দ্রের মতন ওস্তাদ আর নেই। যেখানে কারুর মাথা খেলে না সেখানেও পঙ্গু নয় নরেন্দ্রের মাথা। তার মূল্যবান সাহায্য লাভ ক'রে পুলিস অনেক বড় বড় মামলার কিনারা ক'রে যথেষ্ট সুনাম কিনেছে, অথচ নরেন্দ্র জনসাধারণের কাছে কোনদিনই নিজের নামকে বিজ্ঞাপিত করতে রাজি হয়নি। জনসাধারণ তাকে চেনে না বললেই চলে। তার বাহাদুরি জানে কেবল পুলিস এবং অপরাধীরা।

কিন্তু যে ব্যক্তি এমন অসাধারণ বাহাদুর, তাকে চোখে দেখলে আপনারা দস্তুরমত অবাক হয়ে যাবেন। ভগবান তার দেহখানিকে গড়েছেন প্রায় বামন ক'রেই। লম্বায় সে চার ফুট আড়াই ইঞ্চির চেয়ে বেশী হবে না, আর চওড়ায় তাকে দেখতে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ তালপাতার সেপাইয়ের মতন। কিন্তু দেহের হ্রস্বতা ও কৃশতার জন্যে তার যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে, সেটা পূরণ ক'রে নিয়েছে তার অদ্ভুত মাথাটা। কারণ, দেহের তুলনায় তার মাথাটি অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড। দেখলে ভয় হয় যে, তার অত-বড় মাথাটার ভার ঐটুকু পল্‌কা দেহ বেশীদিন বোধ হয় সহ্য করতে

পারবে না। দূর থেকে তাকে দেখায় যেন একটা হেঁড়ে-মাথা রোগা-লিকলিকে ছোট্ট ছেলের মতন। বাস্তবিক, চেহারার দিক দিয়ে সকলকেই সে রীতিমত হতাশ ক'রে দেয়।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রাণের বন্ধু নারায়ণের চেহারা হচ্ছে একেবারে অন্যরকম। তাকে দানব বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার মতন সুদীর্ঘ দেহ কলকাতায় আর কারুর আছে ব'লে মনে হয় না। তার মাথার উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে সাত ফুট। চওড়াতেও তার দেহ জাগায় মনের ভিতরে বিপুল বিস্ময়। তার বুকের ছাতির বেড় সহজ অবস্থায় আটচল্লিশ ইঞ্চি এবং স্ফীত হলে সেই আশ্চর্য্য ছাতির বেড় দাঁড়ায় গিয়ে পঞ্চান্নো কি ছাপ্পান্নো ইঞ্চিতে। বড় বড় পালোয়ান গুণ্ডাও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে ভয়ে কুঁচকে পড়ে। শিশুরা তাকে দেখলে কেঁদে ককিয়ে ওঠে। সে এমন আশ্চর্য্য শক্তির অধিকারী যে, দুই-তিনজন আরোহীর সঙ্গে একখানা বড় মোটর গাড়ীও দুই হাতে টেনে শূন্যে তুলতে পারে।

গায়ের রঙে এবং প্রকৃতিতেও নরেন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণের আকাশ পাতাল তফাৎ। নরেন্দ্রের গায়ের রং ধবধবে সাদা। আর নারায়ণ হচ্ছে একেবারে আবলুস কাঠের মতন কালো. এমন অসাধারণ কালো রংও বাঙালীদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রকৃতি হচ্ছে ধীর, স্থির. শান্ত। সে কথা কয় ওজন করে, আর যে-কোন কথা বলবার আগে ভেবে-চিন্তে তবে উচ্চারণ করে। আর নারায়ণ? তার হো-হো হাসির ধাক্কায় ল্যাজ খসে পড়বার ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে না

টিক্‌টিকিরাও। সে মহা চঞ্চল, এক জায়গায় পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারে না। কথা কইতে কইতে সর্ব্বদাই সে বসছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং মেঝে-কাঁপানো পদযুগলকে চালনা ক'রে ঘুরে আসছে এদিকে ওদিকে—যেন মানুষ-চর্কী! আর তার মুখের কথা? তার মুখ যেন কথার তুবড়ি! এবং তার মুখের কথার ভিতরে শিশুত্বও বড় কম থাকে না।

বিচিত্র এই মানুষ দুটি—কেউ কারুর মতন নয়, অথচ দু'জনেই দু'জনের মনের মতন!

লোকে বিস্ময়প্রকাশ ক'রে বলে, তেলে আর জলে এমন মিল হ'ল কেমন ক'রে?

নারায়ণ হেসে বলে, "আমরা কেউ তেলও নই আর জলও নই। ভগবান আমাদের একসঙ্গে গড়েছেন পরস্পরের অভাব পূরণ করবার জন্যে। নরেনের দেহ নেই বটে কিন্তু মস্তিষ্কের দিক দিয়ে ও হচ্ছে মস্ত! আমার মস্তিষ্কের বালাই নেই, কিন্তু আমার দেহখানি নয়ন ভ'রে দর্শন করছ তো? ব্যাপার কি জানো ভায়া? নরেন আমার হয়ে ভাবে, আর আমি নরেনের হয়ে হাতে-নাতে কাজ করি।"

লোকে বলে, "তাহ'লে তুমি নিজেকে যন্ত্র ব'লে মনে কর নাকি?"

নারায়ণ বলে, "ঠিক তাই। আমি হচ্ছি যন্ত্র, আর নরেন হচ্ছে যন্ত্রচালক!"

এই হ'ল নর-নারায়ণের পরিচয়। এইবারে দেখা যাক্ তারা এখন কি করছে।

বর্ষাকালের একটি ভিজে প্রভাত। ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঢালছে হুড়্ হুড়্ ক'রে জলের ধারা। রাজপথ হয়েছে যেন একটি নদীর মত। সকাল বেলাতেও রাস্তায় মানুষের সাড়া এত কম যে, মনে হয় সহরের ঘুম যেন এখনো ভাঙেনি। ঘরে ঘরে কেরাণীরা প্রায় রাত্রির মতন কালো আকাশ এবং জলতরঙ্গময় রাজপথের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে ভাবছে, আজ চাকরির মানরক্ষা করা যায় কেমন ক'রে ?

খাবার টেবিলের তুইধারে সামনাসামনি ব'সে নরেন এবং নারায়ণ। নরেনের সুমুখে টেবিলের উপরে রয়েছে একখানি খবরের কাগজ, তুইখানি খুব পাতলা 'টোষ্ট' ও এক পেয়ালা চা।

আর নারায়ণের সুমুখে রয়েছে দস্তুরমত সমারোহের ব্যাপার। খুব-বড় একটি চায়ের পেয়ালা, মস্ত-একটা চায়ের কেট্‌লি, থাকে থাকে সাজানো অনেকগুলো 'টোষ্ট', গোটা-ছয়েক 'এগ্-পোচ্', গোটা-ছয়েক সিদ্ধ ডিম আর আস্ত একখানা 'প্লাম্-পুডিং'! সে একবার খাবারের থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, তারপর এক চুমুকে সব চা নিঃশেষ করে ঘন-ঘন কেট্‌লি তুলে নিয়ে শূন্য পেয়ালায় ঢালছে চায়ের ধারা।

নরেনের একটিমাত্র পেয়ালার আধখানাও যখন খালি হয়নি, নারায়ণের এক-কেট্‌লি চা এবং সমস্ত খাবার হ'ল তার মুখের ভিতরে অদৃশ্য।

নারায়ণ চীৎকার ক'রে উঠল, "বেয়ারা! বেয়ারা!"

নরেন ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মৃদু স্বরে বললে, "আবার বেয়ারাকে কেন?"

—"পেট ভরল না, আরো খাবারের দরকার।"

—"নারায়ণ, তোমার এই বাড়াবাড়িটা আমি পছন্দ করি না। সকাল-বেলাতেই উঠে তুমি যা গলাধঃকরণ করলে, তাই খেয়ে আমার কেটে যেতে পারে পূরো দু'টো দিন।"

নিজের প্রকাণ্ড কালো মুখে ধবধবে দাঁতের বিদ্যুৎ খেলিয়ে কড়িকাঠ-ফাটানো কণ্ঠে নারায়ণ বললে, "বন্ধু, তুমি আর আমি? হাতী আর পিঁপড়ে? তোমার পনেরো দিনের খোরাকেও আমার দেহের একদিনের বেশী চলবে না যে!"

নরেন বললে, "কেবল দেহের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে দিনে দিনে তুমি তোমার মস্তিষ্ককে আরো কাহিল ক'রে ফেলছ। হাতী খুব প্রকাণ্ড জীব বটে, কিন্তু তাকে দাসত্ব করতে হয় ক্ষুদ্র মানুষেরই।"

নারায়ণ বললে, "কিন্তু ভায়া, আমার মস্তিষ্কের ভার তো আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। এজন্যে আমাকে খোঁটা দিয়ে তোমার কোনই লাভ হবে না। আমার মস্তিষ্ক তুমিই, আর তোমার দেহ হচ্ছে 'আমি'। কেমন, আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্তই পাকা হয়ে আছে কিনা? অতএব আমাকে দেহরক্ষা করবার অবসর দাও। বেয়ারা, বেয়ারা! আরো খান্-ছয়েক 'টোষ্ট', আর আধ-ডজন 'এগ্ পোচ্'!"

নরেন আর কিছু বলবার চেষ্টা না ক'রে চায়ের পেয়ালায় ছোট একটি চুমুক্ দিয়ে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলে। আবার এলো 'এগ্ পোচ্', 'টোষ্ট' আর এক কেট্লি চা। নারায়ণ আবার নতুন খাবার গুলোকে আক্রমণ করলে বিপুল বিক্রমে।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় একখানা গাড়ী থামার শব্দ হ'ল। নরেন কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, "এই বাদলে বাড়ীর দরজায় আবার কার গাড়ী এসে থামল !"

নারায়ণ একটা বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী ক'রে বললে, "হয়তো কোন মক্কেল ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আজ যেন কেউ আমাদের বাইরে বেরুবার অনুরোধ না করে ! আমার এতখানি ডাগর দেহ একবার ভিজে গেলে শুকোতে লাগবে সারাটা দিন।"

ঘরের ভিতরে যে হোম্‌রা-চোম্‌রা লোকটি এসে ঢুকলেন, তিনি হচ্ছেন পুলিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন বিস্মিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "একি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ! এমন দুর্য্যোগে এমন অসময়ে আপনি !"

শচীনবাবু বললেন, "এক সমস্যায় ঠেকে গিয়েছি মশায় ! তাই ঠক্‌বার আগেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।"

নরেন বললে, "ঠক্‌বার ভয় আছে নাকি ?"

—"আছে বৈকি ! হয়তো এর মধ্যে বেশ খানিকটা ঠ'কেও গিয়েছি।"

নরেন বললে, "পুলিস যেখানে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে, ব্যাপারটা সেখানে মারাত্মক ব'লেই সন্দেহ হয় !"

—"হ্যা মশাই, মারাত্মক বিভ্রাটের মধ্যেই প'ড়ে গাছি।"

—"ভালো, বসতে আজ্ঞা হোক্ ! চা-টা কিছু ইচ্ছা করেন ?"

—"কিছু না, কিছু না ! ও সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি" বলতে বলতে শচীনবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লেন।

নরেন একখানা সোফার উপরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল, তার ছোট দেহখানি সোফার ভিতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

শচীনবাবু বললেন, "ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আর গোপনীয়। গোড়াতেই আপনাকে এই কথাটা ব'লে রাখতে চাই।"

নরেন কোন জবাব দিলে না, শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

শচীনবাবু বললেন, "খবরের কাগজে পঞ্চম-বাহিনীর কথা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এদেশের কোনো কোনো গুপ্তচর আমাদের প্রধান শত্রু জাপানকে গোপনে সাহায্য করছে।"

—"আপনার এমন সন্দেহের কারণ ?"

—"আমরা প্রমাণ পেয়েছি; কোনো কোনো সরকারি গুপ্তকথা বাইরে ব্যক্ত হবার আগেই একেবারে শত্রুপক্ষের কাণে গিয়ে উঠছে। এমন কি এখানে কোনো বড় জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছবার তিন চারদিন পরেই সেই খবর সরাসরি গিয়ে হাজির হচ্ছে জাপানীদের কাছে।"

—"কেমন ক'রে জানলেন ?"

—"শত্রুশিবিরে আমাদেরও গুপ্তচরের অভাব নেই তো! আমরা খবর পাচ্ছি তাঁদের কাছ থেকেই।"

—"গুরুতর কথা বটে। কারুকে সন্দেহ করতে পেরেছেন ?"

শচীনবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না। আমরা একেবারে অন্ধকারে প'ড়ে আছি।"

—"আপনি আমাদের কি করতে বলেন ?"

—"আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই আমরা অপরাধীদের আবিষ্কার করবার কিছু কিছু চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমরা যে গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করি, মামলার ভার পাবার কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। তারপর নিযুক্ত করি আর একজন গোয়েন্দাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই তাকেও ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তারপর নিযুক্ত করি তৃতীয় ব্যক্তিকে, কিন্তু সেও আজ বেঁচে নেই। বুঝতে পারছেন, ঘটনাগুলো কেবল রহস্যময়ই নয়, রীতিমত সন্দেহজনক।"

সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে ব'সে নরেন ধীরে ধীরে বললে, "তিন-তিনজন লোক একই মামলার ভার নিয়ে পরে পরে মারা পড়েছে। কথাটা শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে। কেমন ক'রে তারা মারা পড়ল ? কেউ তাদের খুন করেছে ?"

—"খুনোখুনি বা মারামারির কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি।"

—"তবু তারা মারা পড়ল কেন ?"

—"স্বাভাবিক ভাবেই বিছানায় শুয়ে।"

—"মানে ?"

—"তারা প্রত্যেকেই মারা পড়েছে একই রোগে।"

—"রোগটা কি ?"

—"নিউমোনিয়া !"

নরেন আবার সোফার উপরে এলিয়ে প'ড়ে, দুই চক্ষু মুদে স্তব্ধ হয়ে রইল। নারায়ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে আবার শচীনবাবুর সামনে এসে ব'সে পড়ল। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা হতভম্ব ভাব।

নরেন আবার চক্ষু মেলে মৃদুকণ্ঠে বললে, "স্বাভাবিক মৃত্যুর ভিতরেও যে এমন অস্বাভাবিক যোগাযোগ থাকতে পারে, এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। একই মামলার ভার নিয়েই তিনজনে মারা পড়ল একই 'নিউমোনিয়া' রোগে ?"

নারায়ণ বললে, "বাবা, আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছেই, পেটের পিলেও বিলক্ষণ চমকে গিয়েছে। আজকাল 'নিউমোনিয়া' ব্যাধিও শত্রুপক্ষে যোগদান করেছে নাকি ?"

শচীনবাবু বললেন, "এখন বলুন দেখি নরেনবাবু, এ-রহস্যের তল কোথায় ? এগুলো যদি হত্যাকাণ্ড না হয় তাহ'লে এগুলো কি ? এই কথা জানবার জন্যেই আমি এসেছি আপনার কাছে।"

নরেন তেমনি মৃদুস্বরেই বললে, "এত তাড়াতাড়ি জোর ক'রে আমি কোনই মত প্রকাশ করতে রাজি নই। পঞ্চম-বাহিনীর নাম আমরা প্রথম শুনেছি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই। প্রথম প্রথম পঞ্চম বাহিনীর অর্থ বুঝতেও কষ্ট হত, এখন খবরের কাগজে তার উদাহরণ পেয়ে বুদ্ধি কতকটা খুলেছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধেও তথাকথিত পঞ্চমবাহিনীভুক্ত একজাতীয় জীবের অভাব ছিল না। তাদের অধিকাংশ ইতিহাসই প্রকাশিত হয়েছে, আর আমিও তা প'ড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। আমার স্মরণ হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরণেরই কোনো কোনো ঘটনা ঘটেছিল।"

শচীনবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘটনাগুলো কি-রকম ?"

—"আপাততঃ তা শুনে কাজ নেই। কারণ, গোড়া থেকেই

কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'লে আমরা অনায়াসেই বিপথে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি। এখন আপনার কি কর্ত্তব্য জানেন?"

—"বলুন।"

—"আপনি আজই প্রচার ক'রে দিন যে, এই মামলার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছি আমি।"

—"তাতে আপনার কিছু সুবিধে হবে?"

—"যথেষ্ট। আমি দেখতে চাই, আমার সন্দেহ সত্য কিনা। অর্থাৎ এই তিনটে মৃত্যুর মধ্যে কোনো গুরুতর অপরাধের নিদর্শন আছে কিনা। আমি অপরাধীদের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। আজ আর কোনো কথা নয়, আমাকে এখন কিছু ভাববার সময় দিন।" নরেন আবার তার দুই চক্ষু মুদে ফেলে ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

শচীনবাবুর হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু তিনি নরেনের স্বভাব জানতেন। তিনি বুঝলেন, আপাততঃ সে কিছুতেই ভঙ্গ করবে না তার মৌনব্রত। অতএব আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সেদিনের মতন বিদায়-গ্রহণ করলেন।
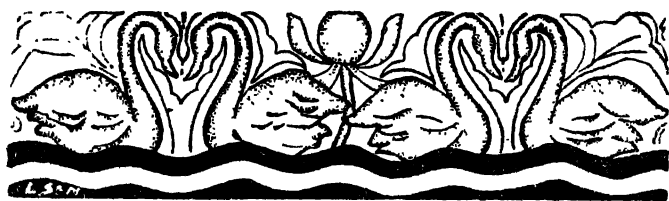
দ্বিতীয়

পকেটমারের কীর্ত্তি

শচীনবাবু ঘরের ভিতর থেকে যেই অদৃশ্য হ'লেন, নরেন অমনি আবার চক্ষু মেলে বললে, "নারায়ণ, অবিলম্বে গাত্রোত্থান কর।"

নারায়ণ তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তারপর ?"

—"তারপর সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হও।"

"আমি প্রস্তুত। কিন্তু কারণ ?"

—"কারণ, জান্‌লার ভিতর দিয়ে আমি বারবার লক্ষ্য করেছি, রাস্তার ওধারের ফুটপাতের উপরে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে একটি ভদ্রলোক মূর্ত্তির মত চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। ওর ঐ উদাসীনতা সন্দেহজনক, কারণ শচীনবাবুর গাড়ী চ'লে যাওয়ার পরেই ও-লোকটিরও পদযুগল রীতিমত সচল হয়ে উঠল। এখন আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না! তুমি তার পিছনে পিছনে ধাবমান হ'তে পারবে ?"

—"অনায়াসে। কিন্তু তাকে চিনব কেমন ক'রে ?"

—"সে ও-ফুটপাত ধ'রে এইমাত্র উত্তর দিকে গিয়েছে। তার পায়ের দিকটা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তার গায়ে আছে একটি নীল রঙের পাঞ্জাবী, চোখে আছে চশমা, ঠোঁটে আছে গোঁফের রেখা, মাথায় আছে গান্ধী-টুপি আর হাতে আছে মোটা মালাক্কা বেত। মাথায় সে মাঝারি আর তার গায়ের রং তোমার চেয়ে ফর্সা হ'লেও রীতিমত কালো। যাও।"

নারায়ণ দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললে, "নারায়ণ, আর একটা দরকারি কথা শুনে যাও।"

দরজার ওপাশ থেকে নিজের মস্ত মুখখানা বাড়িয়ে নারায়ণ বললে, "কি হুকুম হুজুর ?"

—"লোকটা এখনো আমাদের উপরে হয়তো কোনো সন্দেহ করতে পারেনি। খুব সম্ভব তুমি ওর আড্ডার সন্ধান পাবে। যদি পাও, ওর আড্ডার উপরে পাহারা রাখবার ব্যবস্থা ক'রে এস।"

—"আচ্ছা" ব'লে নারায়ণের মুখ আবার আড়ালে চ'লে গেল।

নরেন নিজের মনেই ভাবতে লাগল, কিছুকাল আগেও এদেশী অপরাধীদের সঙ্গে বিলাতী অপরাধীদের তফাৎ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল এদেশেও মাঝে মাঝে এমন অপরাধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যার আদর্শ আছে সাত সাগরের ওপারে। জানি না, আজ যে মামলাটার ভারগ্রহণ করলুম, সেটাও ঐ জাতীয় কিনা!

*　　*　　*　　*

ঘণ্টা-তিন পরে নারায়ণ আবার ফিরে এল

নরেন তখন ব'সে ব'সে খান-কয়েক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ তুলে বললে, "কি খবর নারায়ণ ?"

—"খবর ভালো। আমি একেবারে লোকটার ডেরা পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়িনি। লোকটা থাকে রজনী বোস ষ্ট্রীটের একখানা প্রকাণ্ড ব্যারাক্-বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সে বাড়ীতে নানা জাতের লোকের বাস। তাদের অনেকেই কেউ কারুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সেখানে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে ; বাংলার নানা জেলার লোকও আছে, আবার পশ্চিমের নানাদেশী মানুষেরও নমুনা আছে। এমন-কি দু-ঘর মাদ্রাজীরও খোঁজ পেয়েছি।"

—"সেখানে কোনো পাহারার ব্যবস্থা ক'রে এসেছ ?"

—"করেছি বৈকি ! বাড়ীর সামনে বিজয়কে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

—"কোন্ বিজয় ? চোর বিজয়, না পকেটমার বিজয় ?"

—"পকেটমার।"

—"বেশ করেছ। ছোক্‌রা যেমন চালাক, তেমনি চটপটে।"

এইখানে একটুখানি ব্যাখ্যার দরকার। আপন আপন চেহারার বিচিত্র বিশেষত্বের জন্য নরেন্দ্র ও নারায়ণ ,বৃহৎ জনতার ভিতরে থেকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কোনরকম ছদ্মবেশই নরেনের বালকের মতন দেহের ক্ষুদ্রত্ব এবং নারায়ণের দানবের মতন দেহের বিপুলতা ঢেকে রাখতে পারত না। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাকর।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে তারা একটি উপায় অবলম্বন করেছিল। তারা মাহিনা দিয়ে পুষেছিল এমন কয়েকটি জীবকে,

যাদের পেশা ছিল রাহাজানি, গুণ্ডামি, চুরি ও পকেট-কাটা প্রভৃতি। এ-শ্রেণীর লোক পুলিশে চাকরি না নিলেও গোয়েন্দাগিরির বহু বিশেষত্বের সঙ্গে সুপরিচিত থাকে। সর্ব্বদা পুলিসের ও জনসাধারণের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে রাখতে তাদেরও দৃষ্টি হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এবং প্রকাশ্যে থেকেও কি কৌশলে আত্মগোপন করতে হয়, তারা ভালো ক'রেই জানে সে গুপ্তকথা।

এরা নর-নরায়ণকে দেখত প্রভুর মত। তাদের সংসর্গে এসে তারা পুরোদস্তুর সাধু না হ'লেও অসৎ পথের দিকে সহজে পা বাড়াতে চাইত না। অন্তত তাদের পক্ষে থেকে এইটুকু বলা যেতে পারে, নরেন ও নারায়ণকে তারা কোনদিন ঠকাবার চেষ্টা করেনি, বরং প্রাণপণে আদেশ অনুযায়ী কাজ ক'রে নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। এ-শ্রেণীর লোকের চরিত্র ছিল নরেনের নখদর্পণে। তাদের বশ করবার কৌশল সে জানত।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় পকেটমার বিজয় নরেনের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

নরেন বিরক্ত ভাবে বললে, "বিজয়, তুমি পাহারা ছেড়ে এখানে কেন?"

বিজয় দুই হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর, আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে সেখানে নসীরামকে পাহারায় রেখে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।"

—"কি কথা?"

—"গোড়া থেকেই বলি, শুনুন হুজুর। সেই ব্যারাক্-বাড়ী

খানার সামনে আমার এক আলাপী লোকের একখানা পানের দোকান ছিল। সারাদিন আমি সেইখানেই বসেছিলুম। যে লোকটার উপরে আমাকে নজর রাখতে বলা হয়েছে, বিকেল বেলায় দেখি সে হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়েই হন্ হন্ ক'রে এক দিকে এগিয়ে চলল। আমিও তার পোষা কুত্তার মতন লোকটার পিছু নিলুম। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে তার সঙ্গে আমিও একখানা বাসে উঠে বসলুম। রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ের কাছে লোকটা বাস থেকে নেমে পড়ল। তারপর টালিগঞ্জের দিকে হেঁটে খানিকটা গিয়ে একখানা বড় বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল, আমি চুপ্ ক'রে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে বাড়ীর বাইরে এসে সে আবার উঠল ধর্ম্মতলার এক ট্রামে। আমিও উঠলুম। ট্রামে এত ভীড় যে আমাদের দুজনেরই বসবার জায়গা হ'ল না। তার গায়ে গা মিশিয়েই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। তারপর হুজুর—"

—"বল, থামলে কেন? তারপর?"

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বিজয় বাধো-বাধো গলায় লজ্জিত ভাবে বললে, "তারপর হুজুর, কেন জানি না, আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না।"

নরেন একটুখানি হেসে বললে, "বুঝেছি। তুমি লোকটার পকেট মেরে দিয়েছ?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিজয় বললে, "কি আর বলব হুজুর, হাতদুটো কেমন যেন নিস্‌পিস্ করে উঠল! পোড়া মনকেও কত যে বোঝাই, মন তবু বশ মানতে চায় না। তাই—"

নরেন বাধা দিয়ে অধীর স্বরে বললে, "অত আর ওজর দেখাবার দরকার নেই, আসল কথা বল।"

বিজয় কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তার পকেট থেকে পেয়েছি একটা 'মণি-ব্যাগ', একখানা চিঠি, আর ওষুধ-ভরা ছোট্ট একটা কাঁচের নল্‌চে। আমার মনে হ'ল এগুলো হুজুরের কাজে লাগতে পারে। তাই আমি এখানে ছুটে এসেছি।"

নারায়ণ বিজয়ের পিঠের উপরে এক থাব্‌ড়া বসিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ব'লে উঠল, "ভ্যালা মোর বাপ্‌ রে, জীতা রহো!"

নরেন গম্ভীর ভাবে বললে, "আচ্ছা, চিঠিখানা আর ওষুধের নলচেটা আমার হাতে দাও। মণিব্যাগটা তুমি রাখতে পারো। আর তোমাকে দরকার নেই।"

বিজয় একটা সেলাম ঠুকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়ল।

ছোট্ট একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতরে পুরু তুলো জড়িয়ে একটি কাঁচের চুঙি সযত্নে রাখা হয়েছে। চুঙিটির দু-মুখই বন্ধ, ডাক্তাররা 'ইন্‌জেক্‌সন' দেবার সময় এই রকম ওষুধ-ভরা কাঁচের চুঙি ব্যবহার করেন।

নরেন সেটিকে আলোর দিকে ধ'রে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, "চুঙির ভিতরে এই জলীয় পদার্থটা যে কি, আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না। দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা দরকার।"

চুঙিটিকে আবার যথাস্থানে রক্ষা ক'রে নরেন চিঠি-ভরা খোলা খামখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপ রখামখানা

উল্টেপাল্টে ভালো ক'রে দেখে বললে, "দেখ নারায়ণ, খামের ওপরে ডাকঘরের ছাপ নেই। পত্রলেখক বোধ হয় ডাকঘরকে বিশ্বাস করে না, তাই চিঠি বিলি করেছে অন্য কোনো লোকের হাত দিয়ে। খামের এককোণে খালি একটি নাম লেখা রয়েছে,—'নৃপেশ'। আচ্ছা, এইবার চিঠিখানা বা'র ক'রে প'ড়ে দেখা যাক্।"

চিঠিখানা এই :

"নৃপেশ,

শচীন দত্তের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সন্ধান নেবে, সে আর কোনো নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে কিনা। যদি কোনো নতুন খোঁজ-খবর পাও, তাহ'লে তখনি আমাদের তিন নম্বর বাড়ীতে চ'লে আসবে। আমি দিন-তিনেকের জন্যে ঐ বাড়ীতে থাকব। তারপর আমাকে পাবে হপ্তাখানেকের জন্যে আমাদের চার নম্বর বাড়ীতে।

ছোটবাবু।"

নরেন বললে, "চিঠির উপরে তারিখ লেখা রয়েছে তেস্‌রা। আজ হচ্ছে পাঁচ তারিখ। তাহ'লে পত্র-লেখক আজই তিন নম্বরের বাসা ত্যাগ করবে। ধ'রে নেওয়া যাক, বিজয় আজ টালিগঞ্জের যে বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিল, সেই-খানাকেই তিন নম্বরের বাড়ী বলা হয়েছে। তাহলে এর পরেও আছে চার নম্বরের বাড়ী, যার ঠিকানা আমরা জানি না।"

নারায়ণ বললে, "যদিও তুমি আমার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার কর না, তবু আমার মনে হচ্ছে, এই চিঠিখানার ভেতরে আছে যেন কোনো ষড়যন্ত্রের গন্ধ!"

নরেন বললে, "তোমার মস্তিষ্ক না থাকুক, ঘ্রাণশক্তি যে আছে এ-কথা আমি কোনো দিনই অস্বীকার করি না। হ্যাঁ, এই পত্রে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বৈকি! এই ছোটবাবু নামক মহাত্মাটি যে কে তা আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, এই লোকটি আমাদের শচীনবাবুর পিছনে নিযুক্ত করেছে গুপ্তচর। কোনো একটি মামলার জন্যে শচীনবাবু আর কোনো নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন কিনা, এটা জানবার জন্যে তার যথেষ্ট আগ্রহ। মামলাটা কোন্ জাতীয় সেটা তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ কি?"

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, "আন্দাজি ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস যে আমার নেই, তুমি এ কথা জানোই তো নরেন!"

নরেন বললে, "কিন্তু আমার সে অভ্যাস আছে। এই কথাগুলো লক্ষ্য কর—'আর কোনো নতুন গোয়েন্দা'। এথেকে কি এই বুঝায় না যে, এটা হচ্ছে এমন কোনো মামলা যার জন্যে শচীনবাবু আগে এক বা একাধিক গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন, পরে আবার নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে পারেন? কিন্তু সেই বিশেষ মামলাটি কি? শচীনবাবুর নিজের মুখেই আমরা শুনেছি, পঞ্চমবাহিনীর অপরাধীদের আবিষ্কার করবার জন্যে পুলিশ থেকে পরে পরে তিনজন গোয়েন্দাকে কাজে লাগানো হয়েছিল, আর তিনজনই একে একে মারা পড়েছে। হ্যাঁ নারায়ণ, এ সেই পঞ্চমবাহিনীর মামলা না হয়ে যায় না।"

নারায়ণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

নরেন বললে, "ব্যাপারটা গোড়া থেকে আরো ভালো ক'রে

বোঝবার চেষ্টা করা যাক। পুনরুক্তি আমি ভালোবাসি না, কিন্তু তোমার মাথায় ভিতরে জটিল কিছু ঢুকাতে গেলে পুনরুক্তি ছাড়া উপায় নাই। শোনো ঃ

"পুলিস টের পেয়েছে, য়ুরোপের মতন এদেশেও পঞ্চম বাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। তারা এখানকার সামরিক গুপ্তকথা সংগ্রহ ক'রে শত্রুপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কি উপায়ে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে আর কি উপায়েই বা তা যথাস্থানে প্রেরণ ক'রে, আমরা এখনো সে-সব জানতে পারিনি। আর সত্য সত্যই এখানে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব আছে কিনা, তাও জোর ক'রে মানা যায় না। আমাদের কাজ করতে হবে কেবল পুলিসের সন্দেহের উপরেই নির্ভর ক'রে। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে হয়তো দেখব, আমরা ছুটে মরেছি কোনো মরীচিকার পিছনে পিছনে!

"কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে, পুলিস হাওয়ার উপরে কোনো মামলা খাড়া করেনি, পুলিসের সন্দেহের মূলে বস্তু আছে। পুলিস দেখেছে, এখানকার সামরিক তথ্য বাইরে প্রকাশ পাবার আগেই জাপানীদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই আশ্চর্য্য রহস্যের তল খোঁজবার জন্যে পুলিস একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে। হঠাৎ সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ল। অবশ্য এজন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই, কারণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

"তারপর নিযুক্ত হ'ল দ্বিতীয় গোয়েন্দা, আর সেও মারা পড়ল ঐ নিউমোনিয়া রোগেই! পুলিস কিঞ্চিৎ চমকিত হ'ল বটে, কিন্তু তখনো ভাবলে এ হচ্ছে দৈবের খেলা। তারপর

তৃতীয় গোয়েন্দার প্রবেশ এবং ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়ে সেও করলে ইহলোক থেকে প্রস্থান! পুলিস এবার দস্তুরমত ভীত হয়ে উঠেছে, কারণ এ-রকম অসম্ভব দৈব বিড়ম্বনা কল্পনাও করা যায় না। পুলিস তাই তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসেছে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যে। এই মামলায় নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত হ'লেই সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ে কেন? ভিন্ন ভিন্ন রোগে তারা মারা পড়লে হয়তো পুলিস এতটা সজাগ হয়ে উঠত না—যদিও একই মামলায় নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপর-উপরি তিন তিন গোয়েন্দার মারা পড়াটাও হচ্ছে যথেষ্ট সন্দেহজনক।

"বুঝে দেখ নারায়ণ, এইবারে এই মামলায় নিযুক্ত হয়েই আমরা দৈবক্রমে একখানা অদ্ভুত পত্র হস্তগত করেছি। পত্রলেখক তার এক চরে উপরে আদেশ দিয়েছে, পুলিশ কোনো নূতন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে কিনা সে যেন সেই সন্ধান নেয়। এখন তোমার কি মনে হয়? অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছ কি?"

টেবিলের উপরে সশব্দে মুষ্টি প্রহার ক'রে নারায়ণ ব'লে উঠল, "ঠিক! ঠিক! এইবারে আমারও চোখ ফুটল।"

নরেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "শেষ পর্য্যন্ত তোমার চোখ ফুটেছে দেখে পরম আশ্বস্ত হলুম। হ্যাঁ! শচীনবাবু আবার একজন নতুন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়েছেন—আর সে হচ্ছি আমি। তারপরে ভাববার কথা হচ্ছে, রাস্তা থেকে আজই একটি উদাসীন ভদ্রলোক দেখে গিয়েছে, আমার সঙ্গে শচীনবাবুর

মিলন। তাই সে 'রিপোর্ট' দাখিল করবার জন্যে টালিগঞ্জের পত্রলেখকের সেই তিন নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে কি পরামর্শ হয়েছে, আমরা তা জানি না। তবে এইটুকু অনুমান করতে পারি, 'রিপোর্ট' পেয়ে ছোটবাবু নিশ্চয়ই খুব চন্‌মনে হয়ে উঠবেন। অতএব এখন আমাদের যে কোনো ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।"

বিপুল উৎসাহে একটি লম্ফত্যাগ ক'রে সোফার ওপাশ থেকে এপাশে এসে প'ড়ে নারায়ণ ব'লে উঠল, "ফুলচন্দন পড়ুক্ তোমার মুখে! হ্যাঁ বন্ধু, আমি চাই ঘটনা, ঘটনা— ঘটনার ঘোর ঘটা! মুহূর্ত্তে নতুন নতুন বিপদ আর বিস্ময় আর উত্তেজনা! আমার এ দেহ হচ্ছে দস্তুরমত পুরুষের দেহ, সোফায় নরম 'কুশনে' হেলান দিয়ে ব'সে থাকবার জন্যে ভগবান এ-দেহ নির্ম্মাণ করেন নি।"

নরেন কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়ে বললে, "এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, এই ছোটবাবুটির নাম আর পরিচয় কি? দলের মধ্যে সে কোন্ স্থান দখল ক'রে ব'সে আছে? সেই কি দলপতি, না ছোটবাবুর উপরেও মেজোবাবু আর বড়বাবু আছেন? এই দলটি চালনা করছে কোন্ মস্তিষ্ক? যদি তারা পঞ্চম বাহিনীর লোকই হয়, তা'হলে কোন্ উপায়ে শত্রুদের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান করছে? প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলি, তাড়াতাড়ি সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ব'লে মনে করি না।"

নারায়ণ বললে, "কোনো ভাবনা নেই। ইচ্ছা করলেই আমরা আজই সব প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পারি।"

—"কেমন ক'রে ?"

—"চল, আজই সেই ব্যারাক্ বাড়ী থেকে নৃপেশকে ক্যাঁক্ ক'রে ধ'রে আ'ন ।"

—"তারপর ?"

—"তারপর আর কি, নৃপেশ যদি সহজে বশ না মানে, আমার দু-চারটে কিল আর চড় খেলেই মনের কথা উগ্‌রে দেবার পথ পাবে না। এক একটি কিলে তার এক-একখানা হাড় আমি গুঁড়ো ক'রে দেব।"

নরেন মৃদু হেসে বললে, "তোমাকে কেবল হাতীর মতন দেখতে নয়, তুমি হ'চ্ছ হস্তিমূর্খ ! নৃপেশ যদি পাকা অপরাধী হয়, তা'হলে তুমি কিল মেরে তার মুখ ভেঙে দিলেও সে পেটের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। আর নৃপেশকে আমরা ধ'রে আনবই বা কোন্ আইনের জোরে ? তাকে আইনের ফাঁদে ফেলা যায়, তার এমন কোনো অপরাধের কথা এখনো আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। বরং আইনত অপরাধ করেছি আমরাই, কারণ তার পিছনে পকেটমার লেলিয়ে দিয়ে আমরা তার পকেটে যা ছিল সব হস্তগত করেছি।"

নারায়ণ চোখ ও ভুরু নাচিয়ে বললে, "সত্যি কথাই তো। এতক্ষণ আমার এ খেয়ালটা হয়নি। তবে তুমি কি করতে চাও ?"

—"আপাতত নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখতে চাই। গোপনে তার পিছনে লেগে থাকলে শত্রুদের আরো অনেক খবর পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই, একদিনেই আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা

অভাবিত সৌভাগ্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। আর এর মূলে আছে প্রধানত আমাদের পকেটমার চ্যালা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র। ভাগ্যে সে পকেট কেটেছিল! এজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলেও অন্যায় হ'বে না।"

নারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "বিজয়-ছোকরাকে কালই আমি নিমন্ত্রণ ক'রে ভালো ক'রে এক পেট খাইয়ে দেব!"

নরেন ঘাড় নেড়ে বললে, "অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে। পাপীদের উৎসাহিত করলে বিপদের ভয় আছে।"

ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে সাড়া এল, "হুজুর, ভেতরে যেতে পারি কি?"

—"কে?"

—"আজ্ঞে, আমি নসীরাম!"

—"ভেতরে এস। তুমি আবার কি বলতে চাও?"

নসীরাম ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললে, "হুজুর, বিজুর কথায় আজ আমি ব্যারাক্-বাড়ীর একটা লোকের ওপর নজর রেখেছিলুম। বিজু চ'লে আসবার পরই লোকটা হন্তদন্তের মত বাড়ী থেকে আবার বেরিয়ে এসেই একখানা ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় চ'লে গেল। সেখানে আর কোনো ট্যাক্সি ছিল না ব'লে আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না। আমি সেইখানেই চুপ ক'রে বুড়ি ছুঁয়ে ব'সে রইলুম। তারপর বিজু আবার ফিরে এল। আর সেই লোকটাও খানিকক্ষণ হ'ল ট্যাক্সিতে চ'ড়েই আবার ব্যারাক্-বাড়ীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারে সে একলা নয়, তার সঙ্গে আরো দু'জন লোক আছে। এই খবরটা আপনাদের

জানাবার জন্যেই বিজু আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। এখন আমাদের ওপর কি হুকুম হয়?"

—"তোমরা দু'জনেই সেই বাড়ীখানার ওপরে পাহারা দাওগে যাও। খুব সাবধান, লোকটাকে এবার আর এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়ালে যেতে দিও না।"

নসীরাম ভক্তিভরে আবার একটি নমস্কার ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে, "নারায়ণ, ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছ কি?"

—"আবার আমাকে আন্দাজ করতে বলছ? আমি আন্দাজ-ফান্দাজের ধার ধারি না।"

—"কিন্তু, একটা শিশুও এ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। নৃপেশ বাড়ীতে ঢুকেই নিজের কাটা পকেট আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে আর তখনি খবর দেবার জন্যে ট্যাক্সিতে চ'ড়ে সেই তিন নম্বরের বাড়ীতে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছে। তিন নম্বরের বাসিন্দারা খবর শুনে বোধ হয় যথেষ্ট বিচলিত হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এতটা বিচলিত হ'ল? তার কারণ কি এই কাঁচের চুড়ি, না এই চিঠিখানা? তাদের চোখে এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা হচ্ছে বেশী মূল্যবান? আর নৃপেশের সঙ্গে যারা এসেছে তারা কে? একসঙ্গে ছোটবাবু আর বড়বাবু নয় তো?"

নারায়ণ মস্ত একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, "ও-সব ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমার উদরে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।"

নরেন রাগ করে বললে,"তোমার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তুমি রসাতলে গমন কর। আমি আজ একেবারেই আহার করব না।"

নারায়ণ চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "আহার করবে না মানে? উপোস ক'রে থাকবে?"

—"ঠিক তাই। তোমাকে তো কতবারই বলেছি, পেট ভরা থাকলে মস্তিষ্কের ধারও ভোঁতা হয়ে থাকে? শূন্য উদর মস্তিষ্ককে দান করে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি।"

নারায়ণ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "চুলোয় যাক্ তোমার চিন্তাশক্তি! আমি চাই বাহুবল, আমি চাই পেট-ভরা খোরাক!"

তৃতীয়

চিঠি আর চুণি

সেই রাত্রির কথাই বলছি।

নারায়ণ উদরস্থ খাদ্যের ভারে কিঞ্চিৎ কাবু হয়ে নিজের শয়ন-গৃহের ভিতরে অদৃশ্য হ'ল।

নরেন খানিকক্ষণ দোতালার বারান্দার উপরে পায়চারি ক'রে বেড়ালে। তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে যেন মনে মনে কি চিন্তা করছে। মিনিট কয়েক পরে সে আবার নীচে নেমে গেল। তার বাড়ীর পিছন দিকে ছিল ছোট-বড় গাছে ভরা খানিকটা জায়গা। তারা স্থানটিকে বাগান ব'লেই ডাকত, কিন্তু ও-জায়গাটি 'বাগান' আখ্যা লাভ করবার যোগ্য নয়। সেখানে ফুলগাছ চোখে পড়ত না একটাও, কিন্তু আগাছার ছড়াছড়ি ছিল যত্র-তত্র।

নরেন কোথা থেকে একটা বড় চাঙাড়ি সংগ্রহ ক'রে এনে তাদের বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। জমির সর্ব্বত্রই পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল গাছ থেকে খ'সে-পড়া শুক্‌নো পাতা। সেই শুক্‌নে

পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে চাঙাড়ির ভিতরে রাখতে লাগল। চাঙাড়ি পূর্ণ হ'লে পর সেটা নিয়ে আবার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপরে প্রত্যেক সিঁড়ির উপরে সেই শুক্‌নো পাতাগুলো ছড়াতে ছড়াতে নরেন তাদের দ্বিতল বাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত গিয়ে উঠল। চাঙাড়ি খালি হ'লে পর সে আবার নেমে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

নরেন আর নারায়ণ পাশাপাশি বাস করত দু'টি ঘরে। মাঝখানের একটি দরজা দিয়ে তারা পরস্পরের ঘরে আনাগোনা করতে পারত।

নরেন নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে নারায়ণের বিরাট নাসিকার বিকট গর্জ্জন। সে আগে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে, তারপর মাঝের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে নারায়ণের ঘরে।

এর মধ্যেই নারায়ণ মুখব্যাদান ক'রে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে। তার নিদ্রাকে নাম দেওয়া যেতে পারে 'ইচ্ছানিদ্রা' —অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই সে একেবারে নিদ্রা-সাগরে তলিয়ে যেতে পারত।

নরেন সেই ঘরের বাইরে যাবার দরজাটির খিল ভিতর থেকে খুলে রাখলে। আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর একখানা ইজি-চেয়ার টেনে এনে এমন জায়গায় রাখলে, যাতে ক'রে সেই চেয়ারে ব'সে মাঝের দরজা দিয়ে নারায়ণের শয্যাটি ভালো ক'রে দেখা যায়।

নারায়ণের ঘর অন্ধকার। নরেন নিজের ঘরের আলোও

নিবিয়ে দিলে। তারপর ইজি-চেয়ারের উপরে ব'সে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় স্থির হয়ে রইল।

রাত্রি ক্রমে বাড়ছে, সহরের নানান্ রকম গোলমাল ক্রমেই ক'মে আসছে। আরো খানিকক্ষণ কাটল। কলকাতার মুখ প্রায় বোবা হয়ে এল। ... ... টুং টুং, টুং! ঘরের ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনটে। সহর একেবারে নিসাড়। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায়, হঠাৎ একটা প্যাঁচা বা কুকুরের চীৎকার। আকাশে বাতাসে বাজছে যেন ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ নীরবতার বীণা। এবং তারই মধ্যে ফাঁক্ পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভালো ক'রে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঘরের ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ।

ঘরে ঘরে ঘুমোচ্ছে সহরের জীবরা। কিন্তু নরেন তখনো সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত—তার চক্ষে ঘুমের এতটুকু আমেজ নেই।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। নরেন যখন ভাবছে আজকের মত অনিদ্রাকে বরণ করা বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন হঠাৎ সে সচমকে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল!

তার কান যা শুনতে চাইছিল, শুনতে পেয়েছে তা! এক রকম শব্দ হচ্ছে—মড়্ মড়্, মড়্ মড়্! কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে দোতালার ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

উৎকর্ণ হয়ে নরেন ব'সে রইল পাথরের পুতুলের মতন। সিঁড়ির উপরে শুকনো পাতার আর্ত্তনাদ। তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই পত্রমর্ম্মর তার কাণে করছে যেন মধুবৃষ্টি! অল্পক্ষণ পরে সব চুপচাপ।

তার পরেই শোনা গেল একটা কর্কশ শব্দ—যেন কেউ ধীরে ধীরে ঠেলে ও-ঘরের একটা দরজা খুলছে এবং আওয়াজ হচ্ছে দরজার তৈলহীন কব্জা থেকে। নরেন জানত. ও-ঘরের দরজা কেউ নিঃশব্দে খুলতে পারে না। তাই সে আজ নিজের হাতেই নারায়ণের ঘরের দরজার খিল খুলে রেখে এসেছে। সে আগেই অনুমান করেছিল, আজ এখানে. কারুর ভয়াবহ আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, তার অনুমান মিথ্যা নয়।

নরেন উঠে দাঁড়াল এবং বাঁ-হাত বাড়িয়ে নিজের ঘরের ইলেক্‌ট্রিক সুইচের উপরে আঙুল রাখলে। তার ডান হাতে একটি ছোট্ট রিভলভার। তারপর সে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা তখনো কার হাতের ঠেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তারপর দরজা হ'ল নীরব। নরেন আরো আধ মিনিট অপেক্ষা করলে, তারপর হঠাৎ টিপে দিলে তার ঘরের আলোর সুইচটা। এ-ঘরের আলোটা ছিল এমন জায়গায় যে, সেটা জ্বললেই তার খানিকটা শিখা মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে পড়ে।

আলো জ্বেলেই নরেন দেখলে, নারায়ণের শয্যাশায়ী দেহের উপরে ঝুঁকে রয়েছে.একটা মূর্ত্তি এবং তার উদ্যত হাতে একখানা মস্ত চক্‌চকে ছোরা!

পরমুহূর্ত্তেই ছোরাখানা বোধ হয় নারায়ণের বক্ষ ভেদ করত, কিন্তু নরেন হত্যাকারীকে অস্ত্র ব্যবহারের কোনই সুযোগ দিলে না, লক্ষ্য স্থির না ক'রেই সে নিজের রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলে!

গুলিটা গিয়ে লাগল ও-ঘরের দেওয়ালের উপরে। সচকিত মূর্ত্তিটা হ'ল বিদ্যুতের মত অদৃশ্য! এবং রিভলভারের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙে গেল নারায়ণের। প্রথমটা সে হতভম্বের মতন চারিধারে তাকাতে লাগল। তারপর খাটের নীচে লাফিয়ে প'ড়ে ব'লে উঠল, "কি হয়েছে নরেন? তুমি রিভলভার ছুঁড়লে কেন?"

নরেন শান্তভাবে সহজ স্বরে বললে, "তোমাকে বাঁচাবার জন্যে!"

—"সে আবার কি?"

—"আর একটু হ'লেই খুনীর ছোরা বিঁধত তোমার বুকে!"

—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"বোঝাবুঝি পরে হবে—এখন শীঘ্র আমার সঙ্গে এস! সিঁড়ির ওপরে পাতার শব্দ শুনেই বুঝেছি, খুনী আবার ছাতের দিকে উঠে গিয়েছে।" ব'লেই নরেন বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং নারায়ণও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

ছাদে উঠে নরেন পকেট থেকে টর্চ্চ বার ক'রে চারিদিকে আলোক নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু কোথাও কারুকে দেখা গেল না।

নরেন বললে, "বুঝেছি। এইদিকে এস।" সে দৌড়ে ছাদের একদিকে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে আলো ফেলে দেখলে, ছাদের জল বেরুবার লোহার পাইপ ধ'রে একটা মূর্ত্তি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নারায়ণও মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তারপরেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে সেও তাড়াতাড়ি পাইপ্ ধ'রে নীচের দিকে নামতে গেল। নরেন টপ্ ক'রে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, "কর কি নারায়ণ, কর কি! তোমার ঐ বিপুল দেহের ভার এই তুচ্ছ পাইপটা কি সহ্য করতে পারবে? তুমি কি পাগল হয়েছ?"

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রাস্তার উপরে জাগল বিষম এক আর্ত্তনাদ! কে চেঁচিয়ে উঠল—"খুন করলে, আমাকে খুন করলে! হুজুর, আমাকে রক্ষা করুন!"

—"সর্ব্বনাশ, এ যে বিজয়ের গলা!" ব'লেই নরেন আবার ছাদের আল্সের উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখবার চেষ্টা করলে!

কিন্তু নিশ্চন্দ্র আকাশ ও 'ব্ল্যাক আউটে'র রাত্রি। দৃষ্টিকে অন্ধ ক'রে দেয় রন্ধ্রহীন অন্ধকার। তবু যাতে কারুর গায়ে না লাগে এমন ভাবে নরেন আবার বার-তুয়েক রিভলভার ছুঁড়লে—হত্যাকারীকে ভয় দেখাবার জন্যে। তারপর টর্চ্চের আলো রাস্তার উপরে ফেলে দেখলে, ধূলোয় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে একটা মূর্ত্তি। সেখানে আর কারুকে দেখা গেল না, হত্যাকারী নিশ্চয়ই পলায়ন করেছে।

নরেন বললে, "নীচে নেমে চল নারায়ণ, দেখি বিজয়ের আবার কি হ'ল!"

তু'জনে দ্রুতপদে সেই শুষ্ক পর্ণে পরিপূর্ণ সোপানকে শব্দিত করতে করতে নেমে এল একতালায়। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

বিজয়ের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "হুজুর, আর আমি বাঁচব না !"

নরেন বললে, "নারায়ণ, টর্চ্চটা ধরো তো, আমি একবার বিজয়কে পরীক্ষা ক'রে দেখি।"

নরেন টর্চ্চটা নিয়ে বিজয়ের উপরে আলো ফেলে দেখলে, তার মুখ যন্ত্রণাবিকৃত এবং তার কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ !

নরেন লক্ষ্য করলে বিজয় ছোরার ঘা খেয়েছে কাঁধের উপরে। অল্পক্ষণ ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা ক'রে সে বললে, "ভয় নেই বিজয়, এ-যাত্রা তোমাকে মরতে হবে না। তোমার আঘাত সাংঘাতিক নয়।"

বিজয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত স্বরে বললে, "ঠিক বলছেন হুজুর ? আপনি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছেন না তো ?"

—"না বিজয়, আমার কথা বিশ্বাস কর। কিন্তু তুমি এখানে কেন ?"

বিজয় আস্তে আস্তে উঠে ব'সে বললে, "আপনার হুকুম তামিল করবার জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

—"সংক্ষেপে সব কথা গুছিয়ে বল।"

—"হুজুর বলেছিলেন, নৃপেশকে আমি যেন একবারও চোখের আড়াল না করি। আমি সেই ব্যারাক-বাড়ীর দিকে চোখ রেখে চুপ্ ক'রে বসেছিলুম। হঠাৎ দেখলুম অনেক রাতে দুটো লোক ছায়ার মতন সেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন চারিদিকে ঘুট্‌ঘুটে করছে অন্ধকার, তারা যে কারা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই একটা লোক সিগারেট

ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললে, আর সেই আলোতে দেখা গেল নৃপেশের মুখখানা। তারপর তারা অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল, কেবল শোনা যেতে লাগল তাদের পায়ের জুতোর শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতেই আমি তাদের পিছু নিলুম, এপথ-ওপথ ঘুরে শেষটা তারা এসে দাঁড়াল আপনাদের এই বাড়ীর কাছে। তারপর তাদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারা যে অন্ধকারে কি করছে না করছে কিছুই বুঝতে না পেরে আমি চুপ ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলুম। এগুতে ভরসা হ'ল না, পাছে তাদের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ি। এমনিভাবে খানিকক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে শুনলুম রিভলভারের আওয়াজ। আমি তো ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম, ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারলুম না। তার খানিক পরেই দেখলুম ছাতের ধারে জ্ব'লে উঠেছে আপনার টর্চের আলো আর জলের নল ধ'রে তড়বড় ক'রে নীচের দিকে নেমে আসছে একটা লোক। রাস্তায় প'ড়েই লোকটা ছুটতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁস হ'ল। সে যেই আমার সামনে এসে পড়ল, আমি তখনি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলুম। খানিকক্ষণ ঝটাপটির পরেই লোকটা আমাকে ছুরি মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে আবার পালিয়ে গেল।"

নারায়ণ ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জ্জন ক'রে বললে, "ব্যাটা যদি পড়ত আমার হাতে, তাহ'লে ছোরাসুদ্ধ হাতখানা ঢুকিয়ে দিতুম তার পেটের ভিতরে! একেবারে কীচক-বধ ক'রে ছাড়তুম!"

নরেন একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "বিজয়, তুমি ঠিক দেখেছ তো, আমার বাড়ীর সামনে দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল ?"

বিজয় বললে, "অন্ধকারে ঠিক দেখেছি কিনা কি ক'রে বলব হুজুর ? তবে এইটুকু শুনেছি, দু-জোড়া পায়ের শব্দ আপনার বাড়ীর সামনে এসেই থেমে গিয়েছিল।"

নরেন ভাবতে ভাবতে বললে, "তাহ'লে আর একটা লোক কোথায় গেল ?"

নারায়ণ বললে, "ও-সব কথা পরে ভাবলেও চলবে। বিজয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে এখনো রক্ত বেরুচ্ছে, আগে ও-জায়গাটা 'ব্যাণ্ডেজ' দিয়ে বেঁধে রাখা দরকার।" ব'লেই সে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের দেহ পথ থেকে তুলে নিলে শিশুর মত।

বিজয়ের ক্ষতস্থান ধুয়ে ও বেঁধে দিয়ে একটা ঘরে তাকে সে-রাতের মত শুইয়ে রেখে তারা দুজনে আবার উপরে গিয়ে উঠল।

নরেন নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলার দৃশ্য এবং তার বড় টেবিলের দেরাজগুলো সব খোলা! সে ছুটে গিয়ে একটা খোলা দেরাজের ভিতরে হস্ত সঞ্চালন ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "নারায়ণ, আমার ঘরেও চোর এসেছিল।"

—"সে কি! কখন্ এল ?"

—"খুব সম্ভব একটা লোক নল বয়ে উঠেছিল ছাতের উপরে আর একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল পাহারা দেবার

জন্যে। প্রথম লোকটা বিজয়কে ছোরা মেরে পালিয়ে যাবার পর আমরা যখন সদর খুলে রাস্তায় আসি, দ্বিতীয় লোকটা সেই সময়ে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে এসে ঢুকেছিল। তারপর আমরাও রইলুম বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত, আর সেও আমার ঘরে ঢুকে কাজ হাঁসিল ক'রে আবার দিলে লম্বা! নারায়ণ, এ হচ্ছে অসম্ভব-রকম দুঃসাহসী চোর! চোর যে কে, তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।"

—"কে সে?"

—"নৃপেশ ছাড়া আর কেউ নয়।"

—"কেমন ক'রে জানলে?"

—"বিজয় স্বচক্ষে দেশলাইয়ের আলোতে দেখেছে নৃপেশের মুখ। কিন্তু আমি দেখেছি ছোরা নিয়ে তোমার বুকের উপরে যে-লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, সে নৃপেশ নয়। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে-লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল সেই-ই হচ্ছে নৃপেশ।"

—"কিন্তু সে কি চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়েছে?"

নরেন চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "সেই কাঁচের চুড়ি আর চিঠিখানা।"

নারায়ণ খুসি হয়ে বললে, "বাঁচা গেল! কাঁচের চুড়ি আর চিঠি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই! আমি ভেবেছিলুম, চোর ব্যাটা বুঝি কোনো দামী জিনিষ নিয়ে স'রে পড়েছে।"

চেয়ারের হাতলের উপরে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করতে

করতে নরেন বললে, "উঁহু, তোমার কথা মানতে পারলুম না। ও-দু'টো জিনিষ নিশ্চয়ই মূল্যবান! নইলে ও-দু'টোর জন্যে ওদের এতটা মাথাব্যথা হবে কেন? হয়তো ঐ চুড়ি আর চিঠি যে আমাদের হাতেই পড়েছে, ওরা নিশ্চিতরূপে সে-কথা জানত না। হয়তো ওরা এসেছিল আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে, তারপর দৈবগতিকে পথ খোলা পেয়ে নৃপেশ বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দেখতে এসেছিল তার সন্দেহ সত্য কি না—অর্থাৎ চুড়ি আর চিঠি আমাদের কাছেই আছে কিনা।"

—"তাহ'লে তুমি জানতে যে ওরা আজ এখানে আসবে?"

—"জানতুম বলা ঠিক হবেনা, তবে আন্দাজ করেছিলুম আজ-কালের মধ্যেই ওদের এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।"

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, "আশ্চর্য্য তোমার আন্দাজ! এ-রকম আন্দাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

নরেন দৃঢ় স্বরে বললে, "নিশ্চয়ই পাওয়া যায়! এইটুকু মনে রেখ, এরা সাধারণ অপরাধী নয়। এরা হচ্ছে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। বাংলাদেশের ভিতরে এরা একটা প্রকাণ্ড দল গঠন করেছে। এরা জানে, খুব গোপনে আর তাড়াতাড়ি কাজ করতে না পারলে ধরা পড়তে হবে, আর ধরা পড়লে সকলকেই চড়তে হবে ফাঁশিকাঠে। আমার দৃঢ় ধারণা, ঐ চিঠি আর চুড়ির ভিতরেই এই মামলাটার সমস্ত রহস্যের চাবি লুকানো আছে। ওরা যে-মুহূর্ত্তে সন্দেহ করতে পারলে যে, এই মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছি আমরা আর মামলার ভার পেয়েই আমরা হস্তগত করেছি ওদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র, সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করে ফেললে, ভিতরের

কথা প্রকাশ পাবার আগেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের পথ থেকে সরাতে নয় চিঠি আর চুণ্ডি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ওদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—চিঠি আর চুণ্ডি গিয়েছে আবার ওদের পকেটেই। নারায়ণ, এখন বুঝতে পারছ, কেন আমি আন্দাজ করেছিলুম যে, আমাদের বাড়ীতে আসতে ওরা বিলম্ব করবে না ?”

—“হুঁ, তুমি বুঝিয়ে দিলে, তাই বুঝলুম। কিন্তু আর একটা ব্যাপার এখনো বোঝা যাচ্ছে না। চিঠিখানা আমি পড়ে দেখেছি, কিন্তু ঐ চুণ্ডির ভিতরে কি আছে সেটা তুমি জানতে পেরেছ কি ?”

—“পরীক্ষা ক'রে জানতে পেরেছি বৈকি !”

—“কি জেনেছ শুনি ?”

রহস্যময় হাসি হেসে নরেন বললে, “এখনো তোমাকে বলবার সময় হয় নি।”

নারায়ণ চটে বললে, “তুমি চুলোয় যাও !”
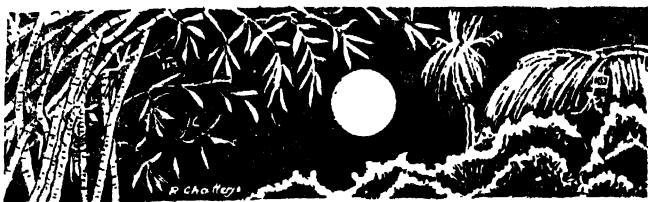
ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ

দিন-তিনেক পরেকার কথা। ডন-বৈঠক দেওয়া এবং মুগুর ভাঁজা শেষ ক'রে নারায়ণ বারান্দার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে হাঁপ ছাড়ছিল। এমন সময়ে নরেনের আবির্ভাব। নারায়ণ ভুরু কুঁচকে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "আজ তিন দিন ধ'রে দেখছি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একলাই হাওয়া খেতে যাচ্ছ।"

নরেন বললে, "হাওয়া খেতে নয় ভাই, কিছু-কিছু খোঁজ-খবর নিতে।"

—"কিসের খোঁজ-খবর? পঞ্চমবাহিনীর?"

—"তাছাড়া আবার কি।"

নারায়ণ মেঝের উপরে সজোরে একটা চপেটাঘাত ক'রে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "না, না, এ-সব ব্যাপারে তোমার একলা যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না!"

—"কেন?"

—"ওরা হচ্ছে ভয়ানক বিপদজনক লোক! একলা ওদের হাতে পড়লে কিছুতেই তুমি আর বেঁচে ফিরে আসবে না! তুমি যত-বড় চালাক লোকই হও না কেন, হাতাহাতির সময় তুমি হ'চ্ছ একটি সামান্য শিশু! তোমার রক্ষাকর্ত্তা হ'তে পারি একমাত্র আমি। এর পরে আমাকে ছেড়ে তুমি রাস্তায় এক পা বেরুতে পারবে না।"

নরেন হেসে বললে, "তথাস্তু! কিন্তু ভায়া, আর একটা কথাও ভেবে রেখো। যে-দলের পিছনে আমরা লেগেছি, সে-দলে গুণ্ডা আর ডাকাতও থাকতে পারে, আর সময়ে সময়ে তারা গায়ের জোরে বা সাধারণ অস্ত্র চালিয়েও নরহত্যা করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপতির নরহত্যার আসল পদ্ধতি হচ্ছে আরো সূক্ষ্ম। সেখানে তোমারও গায়ের জোর কোনো কাজেই আসবে না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এই রকমই আমি আন্দাজ করছি।"

—"নরেন, তোমার আন্দাজের ধাক্কা সহ্য করা ক্রমেই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। তোমাকে নিয়ে আর আমি পারব না, তুমি স্তব্ধ হও!"

—"উত্তম। তোমাকে একটা খবর দিয়েই আমি মৌনব্রত অবলম্বন করব।"

—"কি খবর?"

বারান্দার কোণ থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে নারায়ণের সামনে ব'সে প'ড়ে নরেন বললে, "তুমি জানো, এই মামলায়

আমার আগে আরো তিনজন গোয়েন্দা একই 'নিউমোনিয়া' রোগে মারা পড়েছে ? আমি খবর নিয়ে জানলুম যে, ঐ তিন গোয়েন্দারই চিকিৎসার ভার পেয়েছিল একই ডাক্তার।"

সামনের একখানা রেকাবি থেকে এক মুঠো ভিজে ছোলা তুলে নিয়ে নারায়ণ নিজের বদন-গহ্বরে নিক্ষেপ করলে। তারপর চর্ব্বণ করতে করতে বললে, "তাতে হয়েছে কি ?"

—"হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। ডাক্তারটির নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ, বিলাত-ফেরৎ। ডাক্তারটি একবার জাপানেও বেড়িয়ে এসেছেন। পুলিশ-মহলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাই পুলিশ-বিভাগের অনেকেই অসুখে পড়লে তাঁকেই আহ্বান করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে একটি ব্যাপার।"

"কি ?"

—"একই 'নিউমোনিয়া' রোগে তিন গোয়েন্দার মৃত্যু, আর একই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষের চিকিৎসা।"

নারায়ণ একটু ভেবে বোঝবার চেষ্টা ক'রে বললে, "আমি তো এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো কলকাতায় 'নিউমোনিয়া' রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।"

—"না, তা হয়নি। সে খোঁজও আমি নিয়েছি। কলকাতায় এখন 'নিউমোনিয়া' রোগের বাড়াবাড়ি নেই। আর বাড়াবাড়ি হ'লেও পরে পরে একই মামলায় নিযুক্ত তিনজন গোয়েন্দাই যদি একই ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে 'নিউমোনিয়া'য় মারা পড়ে, তাহ'লে শুনতে যেন কেমন কেমন লাগে না ?"

নারায়ণ হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, "বন্ধু, তুমি একটি মূর্ত্তিমান হেঁয়ালি। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"বুঝেও কাজ নেই। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসা হচ্ছে ডাহা বোকামি।" উঠে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলতে বলতে নরেন নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সে জামা-কাপড় ছেড়ে সবে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হলেন শচীনবাবু। আসন গ্রহণ করবার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "মামলাটার কোনো হদিস করতে পারলেন ?"

নরেন বললে, "কী যে বলেন! এত বড় একটা মামলা, আপনাদের মতন মস্ত মস্ত সব মাথা থাকতেও তিন বেচারা গোয়েন্দার প্রাণ গেল, আর আমি এর মধ্যেই কিনারায় গিয়ে পৌঁছব ? তাও কখনো হয় !"

শচীনবাবু একখানা আসনের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত ক'রে হাসতে হাসতে বললেন, "ভগবান সহায় থাকলে সবই হ'তে পারে নরেনবাবু! আমরা এখনো মামলাটার ঠিক কিনারা না করতে পারলেও ভাগ্যগুণে হঠাৎ দু-একটা গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।"

জিজ্ঞাসু চোখে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে নরেন বললে, "হঠাৎ ?"

—"হ্যাঁ, হঠাৎ। একরকম দৈবগতিকে আর কি! ব্যাপারটা শুনবেন ?"

—"নিশ্চয়ই !"

—"যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। আজ সকালে

আমার এক বন্ধুকে 'ফোন্' ক'রে শুনলুম অচেনা ছু'জন লোকের গলা! অর্থাৎ 'cross connection' আর কি! প্রথম ব্যক্তি বলছে, 'ছোটবাবু, নর-নারায়ণকে আপনি বোধহয় এখনো ভালো ক'রে চেনেন নি। তারা যে মামলার ভার হাতে নেয়, তার শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়ে না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'নৃপেশ, থো করো তোমার নর-নারায়ণের কথা! আমিও তাদের শেষ না ক'রে ছাড়ব না।' নৃপেশ নামধারী ব্যক্তি বললে, 'তাহলে আমার উপরে কি হুকুম হয় বলুন?' সেই ছোটবাবু বললে, 'আসছে অমাবস্যার রাত্রে ঠিক বারোটার সময় চার নম্বরের বাড়ীতে একটা বড় পরামর্শ-সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় আমাদের দলের সবাইকে যোগ দিতে হবে। তোমরাও যেন ভুলো না।' নৃপেশ বললে, 'আমাদের বড়বাবুও কি সেখানে হাজির থাকবেন?' ছোটবাবু বললে, 'নিশ্চয়ই। তিনিই তো সভা আহ্বান করেছেন আর সভাপতি হবেন তিনিই।' নৃপেশ খুসি-গলায় বললে, "তাহলে এতদিন পরে বড়বাবুকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাব?" ছোটবাবু বললে, "মূর্খ! আমি ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ বড়বাবুর মুখ দেখেনি, কখনো দেখতেও পাবে না। বড়বাবু সভায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ ঢাকা থাকবে কালো কাপড়ের মুখোসে। খালি বড়বাবু নয়, তোমাকে আমাকে আর অন্য সবাইকেও সেদিনকার সভায় যেতে হবে মুখোসে মুখ ঢেকে। যথাসময়ে তোমাদের সবাইকেই এক একটি মুখোস উপহার দেওয়া হবে।' নৃপেশ বললে, 'নিজেদের আস্তানায় এতটা লুকোচুরির কারণ কি ছোটবাবু?'

জবাব হ'ল, 'নৃপেশ, আমরা যে কাজে নেমেছি, তাতে পদে পদে মৃত্যু-ভয়। আমাদের দলে লোক আছে অনেক। ভয়ে বা অর্থলোভে বা বাধ্য হয়ে পরে হয়তো কেউ বিশ্বাসঘাতকও হ'তে পারে। সেইজন্যেই এই সাবধানতা। বড়বাবু চান না যে, তাঁর দলের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমরা আসবে, কেউ কারুকে চিনবে না, অথচ এক জায়গায় ব'সে বড়বাবুর সমস্ত উপদেশ শুনতে পাবে।' নৃপেশ বললে, 'বড়বাবুর হুকুম তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্ব্বদা শুনতে পাই! তবে হঠাৎ এত-বড় সভার আয়োজন কেন?' ছোটবাবু বললে, 'নৃপেশ, তুমি জানো, বড়বাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কারুর কোনই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক ব'লেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বন্ধু জাপানীরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানীরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কি করতে হবে জানো? তখন আমাদের—' ....এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে 'cross connection'-এর পালা হঠাৎ সাঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম বটে, তবু যতটুকু শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?"

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ ক'রে শচীনবাবুর কথাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টরও বেশী!"

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, "আসছে অমাবস্যার রাত বারোটার সময়। তার মানে, ঠিক আর সাত দিন পরে। চার নম্বরের বাড়ী। চার নম্বরের বাড়ীর কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায় ?"

শচীনবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, "চার নম্বরের বাড়ীর কথা আপনারাও জানেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বরের নয়, তিন নম্বরের বাড়ীর কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।"

—"তাহ'লে এ মামলার ভিতরে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন ? কিছু কিছু সূত্রও পেয়েছেন ?"

—"হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বটে। ঐ নৃপেশ বাবাজীর সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটবাবুর নামও আমরা শুনেছি, আর বড়বাবুরও অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করেছি।"

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "বটে, বটে, বটে ! অথচ এমন সব জবর খবর এখনো আমাকে দেন নি ?"

—"এখনো দেবার সময় হয়নি শচীনবাবু ! এতক্ষণ আমরা দু'জনে ছিলুম ত্রয়াঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্কে। আপনার 'cross connection'-এর মহিমায় এখন আমরা এসে পড়েছি দ্বিতীয় অঙ্কে। এইবারে আশা করছি তৃতীয় অঙ্কের শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আর আমাদের বেশী দেরি লাগবে না। কি বল হে নারায়ণ ?"

নারায়ণ মস্তকান্দোলন ক'রে বললে, "ধেৎ, আমি কিছুই বলি না। যতক্ষণ না ব্যাটাদের মুণ্ডুগুলো হাতের কাছে পাই, ততক্ষণ

আমি একেবারে বোবা হয়ে থাকতে চাই! আমি কথার মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজের মানুষ!"

শচীনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচম্বিতে চেয়ারের উপরে হেলে প'ড়ে নিজের বুকের উপরে হাত রেখে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে ব'লে উঠল, "উঃ!"

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন. "কি হয়েছে নরেনবাবু? অমন্ করছেন কেন?"

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণ স্বরে বললে, "কেন জানি না, বোধহয় আমার বিষম সর্দ্দি লেগেছে। বুকে দারুণ ব্যথা। মাঝে মাঝে যাতনা আর সহ্য করতে পারছি না।"

নারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কৈ নরেন, তোমার অসুখের কথা তো এতক্ষণ আমাকে বলো নি?"

নরেন তেমনি ভাবেই বললে, "ইচ্ছা ক'রেই বলিনি। কারণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমার নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে!"

শচীনবাবুর দুই চক্ষে রীতিমত আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনার এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাক্তার ডাকান নি কেন?"

নরেন বললে, "হ্যাঁ, আমার ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাক্তারকে ডাকতে আমার ভয় হয়! আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু?"

—"কেন, আমাদের চন্দ্রনাথকে ডাকুন না! পুলিশের

অনেকেই বলে, তাঁর মতন ভালো ডাক্তার নাকি খুব কমই আছেন।”

—“চন্দ্রনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন ?”

—“বহুকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে বর্মায় গিয়েছিল।”

—“কেন ?”

—“এক ধনী রোগীর আহ্বানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানীরা বর্মা আক্রমণ করে। তারপর থেকে কিছুদিন চন্দ্রনাথের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না, আমরা আন্দাজ করলুম সে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দ্রনাথের দেখা পেলুম। আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দ্রনাথ বললে, জাপানীরা রেঙ্গুণ দখল করবার আগেই সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধ'রে অনেক বনজঙ্গল পাহাড় নদী পার হয়ে বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছে। তার মুখে জাপানীদের নিষ্ঠুরতার যে-সব বর্ণনা শুনেছি তা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।”

নরেন বললে, “চন্দ্রনাথবাবু জাপানীদের উপরে নিশ্চয়ই খুব চ'টে আছেন ?”

—“সে কথা আর বলতে ? জাপানীদের কাছে পেলে চন্দ্রনাথ বোধ হয় খালি হাতেই মাথা কেটে ফেলে।”

—“চন্দ্রনাথবাবু বুঝি সর্ব্বদাই জাপানীদের নিন্দা করেন ?”

—“জাপানীদের নিন্দা ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটেই

স্বাভাবিক। জাপানীদের জন্যে তাকে তো কম কষ্টভোগ করতে হয় নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানীদের অনেক কথাই শুনতে পাবেন। চন্দ্রনাথকে খবর দেব কি?"

—"শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধ হয় 'নিউমোনিয়া' হবে। কলকাতায় হয়তো 'নিউমোনিয়া' এবারে মারাত্মক রূপে দেখা দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরো তিন ভদ্রলোক এই রোগে মারা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষই চিকিৎসা ক'রেও ঐ তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেন নি। তাঁর উপরে আমার চিকিৎসার ভার দিলে কোনো বিপদ হবে না তো?"

—"নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত। ডাক্তাররা হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায়ু ফুরুলে ডাক্তাররা কারুকেই বাঁচাতে পারে না।"

নরেন অধিকতর ক্লিন্ন কণ্ঠে বললে, "সে-কথা আমিও মানি। বেশ তবে চন্দ্রবাবুকেই খবর দিন্।"

নারায়ণ হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "না, না, না! ঐ চন্দ্রবাবুকে ডাকা হ'তেই পারে না! ওরই হাতে প'ড়ে তিন-জন—"·········বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল, কারণ সে আরো কিছু বলবার আগেই নরেন গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষম এক চিম্‌টি কেটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, "আপনি কি বলছিলেন নারায়ণবাবু?"

নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, "নারাণের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। ও হচ্ছে একটি আস্ত পাগল!

আমি কিন্তু আর কষ্ট সইতে পারছি না। হয়তো এখনো চিকিৎসার সময় অতীত হয়ে যায়নি। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে এখনি একবার চন্দ্রবাবুকে পাঠিয়ে দেন, তাহ'লে আমি অতিশয় বাধিত হব।"

শচীনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার যাবার পথেই চন্দ্রবাবুর বাড়ী পড়ে। আমি তাঁকে সব কথা জানিয়ে এখনি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাকে হারালে সব-চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব আমরাই।" ব'লেই তিনি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নারায়ণ ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "নরেন, তুমি হঠাৎ অত জোরে আমাকে চিম্‌টি কাটলে কেন?"

নরেন রুক্ষ কণ্ঠে বললে, "কেন? সে-কথা পরে শুনো অখন্। তুমি খালি হস্তীমুর্খ নও, তুমি হচ্ছ গণ্ডমূর্খ!"

নারায়ণ কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তুমি আমাকে এমন শক্ত শক্ত গালাগাল দিচ্ছ কেন নরেন? আমি কি মূর্খতা প্রকাশ করেছি?"

—"তুমি কিছু করনি। তুমি এখন দয়া ক'রে নিজের ঘরে যাও। তারপরে যত-খুসি খাবারের পাহাড় খণ্ড খণ্ড করে কোঁৎ-কোঁৎ ক'রে গিলে নিজের উদরকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ ক'রে তোলো। আজ আর আমি তোমাকে কোনো বাধা দেব না। আজ কেবল দয়া ক'রে এইটুকু মনে রেখো, এখনি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে দেখতে আসবেন। যতক্ষণ তিনি থাকবেন,

এ ঘরে যেন তোমার টিকিটি দেখতে না পাই। আমার এ অনুরোধ রাখবে কি?"

নারায়ণ দস্তুরমত হতভম্বের মতন নরেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটিমাত্র কথা উচ্চারণ না ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন নিজের মনেই মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিলে। তারপর একটা টেবিল টেনে নিজের খাটের পাশে এনে রাখলে। টেবিলের উপরে স্থাপন করলে একই রকমের ছোট-ছোট চার-পাঁচটা গেলাস—যে-রকম গেলাসে লোকে তরল ঔষধ পান করে। একটা ছোট কাঁচের ঢাকনি আগে নিজের বালিসের তলায় রেখে খাটের উপরে উঠে শয়ন করলে। তারপর দুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল।

মিনিট-পঁচিশ পরেই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্ত্তি, রং ফর্সা, পরোনে কোট-পেণ্টলুন। চক্ষুদুটি ছোট হ'লেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। নাক দেখলে মনে পড়ে শুকচঞ্চু। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসির প্রলেপ যেন কখনো শুকোয় না।

সচমকে চক্ষু মেলে নরেন বললে, "কে? কে আপনি? আপনি কি চন্দ্রবাবু, শচীনবাবু এইমাত্র যাঁর কথা ব'লে গেলেন?"

বিনীত ভাবে ঈষৎ অবনত হয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ। শচীনবাবুর মুখে শুনলুম, আপনি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ?"

যন্ত্রণা-ভরা কণ্ঠে নরেন বললে, "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। আমার কি হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার নিঃশ্বাস ক্রমেই যেন বন্ধ হয়ে আস্‌ছে।"

চন্দ্রবাবু কোনো কথা না ব'লে একখানা চেয়ার টেনে এনে নরেনের শয্যার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে 'ষ্টেথেস্‌কোপ্‌'টি বার ক'রে নরেনের পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত ক'রে সুমিষ্ট স্বরে বললেন, "আপনার কোনো ভয় নেই। যথাসময়েই আমায় ডেকেছেন—যদিও আরো-কিছু আগে খবর পেলে আরো শীঘ্র আপনাকে নিরাময় করতে পারতুম। আপনার পীড়া গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করছে বটে, তবু যাতে আপনি দু-তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেন আমি সেই-রকমই একটি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।"

নরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দিন ডাক্তারবাবু, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।"

চন্দ্রনাথের অমন স্নিগ্ধ হাসিমাখা ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল—কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে! তারপরেই তিনি রোগীর দেহের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন, "কোনো ভয় নেই নরেনবাবু। আপনার পীড়া এখনো গুরুতর হয়ে ওঠেনি।" চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশের টেবিলের উপর থেকে একটি ঔষধ পান করবার ছোট কাঁচের গেলাস সামনের দিকে টেনে আনলেন। তারপর তিনি নিজের

ব্যাগের ভিতর থেকে একটি বড় শিশি বার ক'রে সেই গেলাসের ভিতরে ঢাললেন খানিকটা তরল পদার্থ। তারপর সেই ছোট ঔষধের গেলাসটি তুলে নিয়ে নরেনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কী যে করলেন, সেটা বোঝা গেল না।

মুখের উপর থেকে সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন মুছে ফেলে নরেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ চোখে চন্দ্রনাথের পিছন দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার যেই আবার সামনের দিকে ফিরলেন অমনি মুখের ভাব বদলে ফেলে কাতর কণ্ঠে নরেন বললে, "ডাক্তারবাবু, বড় কষ্ট হচ্ছে!"

চন্দ্রবাবু ঔষধের গেলাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা খেয়ে ফেলুন, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে।"

নরেন থর-থর কম্পিত হস্তে ঔষধের পাত্রটি গ্রহণ ক'রে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনাদের অ্যালোপ্যাথিক্ ওষুধ খেতে আমার বড় ভয় হয়। যদি আপনি কিছু মনে না করেন, একটি অনুরোধ করতে পারি কি?"

—"নিশ্চয়ই পারেন! বলুন, আপনি কি বলতে চান?"

—"ঘরের বাইরে ঐ বারান্দার ডান্ পাশেই 'র‍্যাকে' আমার তোয়ালে টাঙানো আছে। অ্যালোপ্যাথিক্ ওষুধ আমি কখনো খাইনি—কি জানি যদি বমন হয়? আপনি অনুগ্রহ ক'রে তোয়ালেখানা একবার এনে দেবেন কি?"

—"একথা আবার বলতে! নিশ্চয়ই আমি এনে দেব!" ব'লেই চন্দ্রবাবু ঘরের বাইরে গেলেন।

সেই মুহূর্তে নরেনের সমস্ত জড়তা এবং অসহায়তার ভাব অদৃশ্য

হয়ে গেল। চন্দ্রবাবুর দেওয়া ঔষধের পাত্রটি বিদ্যুৎবেগে সে হেঁট হয়ে খাটের তলায় রেখে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিসের তলা থেকে ঢাকনিটি বার ক'রে তার উপরে দিলে চাপা। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে ঠিক সেই-রকম দেখতে আর একটি ঔষধ পান করবার শূন্য গেলাস তুলে নিয়ে আবার বিছানার উপরে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন।

চন্দ্রবাবু তোয়ালে হাতে ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে নরেনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে, ওষুধটা খেয়ে ফেলেছেন দেখছি! বেশ, বেশ!" তার মুখের উপরে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির ভাব।

নরেন ঢোঁক গিলতে গিলতে বললে, "খেয়েছি ডাক্তারবাবু! বড় গা বমি-বমি করছে!"

চন্দ্রবাবু বললেন, "কোনো ভয় নেই, ওটা এখনি সেরে যাবে।" তারপর আরো মিনিট-পাঁচেক কথাবার্তা ক'য়ে "কাল সকালে আবার আসব" ব'লে তিনি সেদিনকার মতন বিদায় নিলেন।

নরেন আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে রইল, তারপর হঠাৎ শয্যা ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলে, "ওহে নারায়ণ, ওহে বন্ধুবর, একবার দয়া ক'রে এদিকে আসবে কি?"

নারায়ণ ঘরের ভিতরে এসে বিস্মিত চোখে দেখলে, নরেনের মুখের উপরে রোগের আর কোনো চিহ্নই নেই! জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোমার ব্যাপারখানা কি বলো দেখি? দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কোনো অসুখ হয়েছে!"

নরেন কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "অসুখ? অসুখ আবার কিসের? অসুখ হোক্ শত্রুর!"

নারায়ণ মূঢ়ের মতন বললে, "তাহলে সত্যিই তোমার কোনো অসুখ হয়নি?

—"উঁহু!"

—"তবে ডাক্তার ডেকেছিলে কেন?"

—"কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করব ব'লে।"

—"অসুখ হয়নি, অথচ ওষুধ খাবে?"

—"খাবো কেন? আমি দেখতে চেয়েছিলুম, ডাক্তারবাবু আমাকে কি ওষুধ দেন।"

নারায়ণ মুখভঙ্গী ক'রে বললে, "তোমার কথার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এতক্ষণ ধ'রে রোগের অভিনয় করলে, ডাক্তারবাবু কি ওষুধ দেন কেবল তাই দেখবার জন্যে?"

—"ঠিক তাই।"

—"ওষুধ পেয়েছ?"

—"হ্যাঁ, ঐ দেখ!" নরেন খাটের তলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে।

নারায়ণ হেঁট হয়ে ঔষধের গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে নরেন সবলে তার হাতখানা চেপে ধ'রে ব'লে উঠল, "আরে আরে, কর কি!"

—"হঠাৎ অমন ক'রে উঠলে কেন?"

—"খবরদার, ও ওষুধের গেলাস ছুঁয়ো না!"

নারায়ণ অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন বলো দেখি?"

—"ওর ভেতরে ভীষণ বিষ আছে!"

—"বিষ?"

—"সেই-রকমই তো আন্দাজ করছি। ঐ ওষুধটা এখনি কোনো জীবাণুতত্ত্ববিদের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে আছে 'নিউমোনিয়া'র জীবাণু। নারায়ণ, ঐ চন্দ্রবাবুটি আজ এখানে এসেছিলেন, আমার দেহের ভিতরে 'নিউমোনিয়া' রোগের বীজ বপন করতে।"

নারায়ণ খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "তাহ'লে ঐ ডাক্তারটি হচ্ছে হত্যাকারী?"

—"হ্যাঁ। সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এই অদ্ভুত উপায়ে চন্দ্রবাবু আমার আগেই আরো তিনজন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি করেছেন হত্যা, অথচ আইন বলবে ওদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। আমিও গোড়া থেকেই এই সন্দেহই ক'রে আসছি। কাঁচের চুঙিটা পেয়ে সন্দেহ আমার দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমি জানি, জার্ম্মান গুপ্তচররা এইভাবে অনেক শত্রু নিপাত করেছে।"

নারায়ণ বললে, "হুঁ! এখন বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত হচ্ছেন পঞ্চম বাহিনীর দ্বারাই?"

—"সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই।"

—"ঐ ভয়ানক লোকটাকে তো এখুনি গ্রেপ্তার করা উচিত!"

—"না, এখনো গ্রেপ্তারের সময় হয়নি। এখন ওকে গ্রেপ্তার করলে দলের আর সবাই সাবধান হয়ে যাবে। খালি ওকে

নয়, আমি গ্রেপ্তার করতে চাই সমস্ত দলটাকে। জালে শিকার পড়েছে, আর পালাতে পারবে না। আপাতত আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, চার নম্বরের বাড়ীখানাকে আবিষ্কার করা। এই নাটকের শেষ-দৃশ্যের অভিনয় হবে সেই বাড়ীর ভিতরেই।"

পঞ্চম

জাগো নারায়ণ

দু'দিন পরে ফোনে শচীনবাবুর গলা পাওয়া গেল—"কেমন আছেন নরেনবাবু? আপনার জন্যে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।"

নরেন বললে, "কেন?"

—"শুনলুম আপনার দেহে নাকি 'নিউমোনিয়া'র লক্ষণ দেখা দিয়েছে?"

—"কে বললে?"

—"চন্দ্রনাথ।"

নরেন হেসে বললে, "কালও ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তাহলে তাঁরও বিশ্বাস যে আমি 'নিউমোনিয়া'র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি?"

—"তার তো তাই মত।"

—'জানি না আমার 'নিউমোনিয়া' হয়েছে কিনা। তবে আমার বুকের ভিতরটা বিষম টাটিয়ে উঠেছে, আর একটু-একটু জ্বরও হচ্ছে বটে। হয়তো গোয়েন্দাদের ভিতরে আমিই হ'ব চতুর্থ বলি।"

—"বড়ই আশ্চর্য্য কথা মশাই, এমন যোগাযোগ যে হ'তে পারে আমার ধারণাই ছিল না।"

—"শচীনবাবু, আমি কি স্থির করেছি জানেন ?"

"কি ?"

—"আমি আর চন্দ্রনাথবাবুর চিকিৎসায় থাকব না। নতুন কোনো ডাক্তারকে ডাকব।"

একটু চুপ্ ক'রে থেকে শচীনবাবু বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে আপনার তাই করাই উচিত। এবারে আমারও বিষম সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কি সন্দেহ ?"

—"বেছে বেছে পুলিশের লোকের উপরে 'নিউমোনিয়া'র এই আক্রমণ, এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে কিনা।"

—"সেটা পরে বোঝা যাবে। শচীনবাবু, আপাতত আপনাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে। চন্দ্রবাবুকে দয়া ক'রে জানিয়ে দেবেন যে,আমি এখন শয্যাগত আর নতুন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন। তাঁকে আর কষ্ট ক'রে আমার এখানে আসতে হ'বে না।"

—"জানিয়ে দেব। অবশ্য চন্দ্রনাথ মনে মনে বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হবে। তা' আর কি করা যাবে ? সকলের সব ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস থাকে না।"

নরেন বললে, "না শচীনবাবু, ঠিক তাই নয়। চন্দ্রবাবুর উপরে আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি।"

—"তবে ?"

—"আমার বিশ্বাস নিউমোনিয়া রোগ সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু অনেক নূতন তথ্যই জানেন। এদেশের অনেক ডাক্তারের চেয়ে এ-বিভাগে তাঁর জ্ঞান বোধ হয় খুব গভীর !"

শচীনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তবু আপনি তাঁর চিকিৎসায় থাকতে চান না কেন ?"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নরেন বললে, "কিন্তু অতি-বুদ্ধির মতন অতি-জ্ঞানও যে সময়ে সময়ে মারাত্মক হ'তে পারে, চন্দ্রবাবু হচ্ছেন তারই একটি মূর্ত্তিমান প্রমাণ।"

শচীনবাবু হতভম্বের মতন বললেন, "আপনি কি বলতে চান নরেনবাবু ?"

—"আমি খালি বলতে চাই, চন্দ্রবাবুর অতি-জ্ঞানের মহিমায় উপর-উপরি চারজন পুলিস-কর্ম্মচারী একই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকের টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছে। চন্দ্রবাবু যারই চিকিৎসার ভার নেন তাকেই ধরে নিউমোনিয়ায়। আপনিই বলুন, কোন্ ভরসায় এমন ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করি ?"

শচীনবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "নরেনবাবু, নরেনবাবু, আপনি কিবলতে চান যে—না, না, অসম্ভব !"

তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলে, "চার নম্বরের বাড়ীর ঠিকানাটা আদায় করতে পেরেছেন ?"

—"কেমন ক'রে পারব ?"

—"খুব সহজেই। নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখুন। আসছে অমাবস্যার রাত্রে নিশ্চয়ই সে চার নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে।"

"এ যে আপনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে বলছেন! আমি নৃপেশের নামই খালি শুনেছি তার চেহারাও কখনো দেখিনি. আর সে কোথায় থাকে তাও জানি না।"

—"নৃপেশের ঠিকানা আমি আপনাকে বাৎলে দেব।"

—"কি আশ্চর্য্য, আপনি তার ঠিকানা জানেন?"

"জানি বৈকি! আমার লোকেরাও তার উপরে নজর রেখেছে যে! আপনি আরো ভালোরকম পাহারার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, আপনাদের ফাঁকি দিয়ে সে যেন লুকিয়ে চার নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'তে না পারে।"

শচীনবাবু মহা উৎসাহে ব'লে উঠলেন, "বেশ, বেশ! এই এক চালেই বোধহয় কিস্তি মাৎ করতে পারব! আপনি বাহাদুর ব্যক্তি দেখছি! কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন নরেনবাবু, আপনাকে আমরা হারাতে পারব না। আজ তাহ'লে আসি, নমস্কার!"

একে একে কয়েকটা দিন কেটে গিয়ে এল কালো অমাবস্যার রাত্রি। টেলিফোন যন্ত্রের সামনে ব'সে নরেন ও নারায়ণ কথাবার্ত্তা কইছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনের ঘণ্টা।

'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে নরেন সুধোলে, "হ্যালো কে আপনি?"

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, "আমি শচীন। আপনার কথাই ঠিক! আজ রাত নয়টার সময় নৃপেশ একখানা ট্যাক্সিতে চ'ড়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একখানা মস্ত-বড় কিন্তু সেকেলে বাগানবাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। নিশ্চয়ই ঐখানা হচ্ছে তাদের চার নম্বরের বাড়ী। আমরা একটু পরেই বাড়ীখানা ঘেরাও করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না?"

—"নিশ্চয়ই পারব!"

—"বলেন কি মশাই! ঐ অসুস্থ শরীরে?"

—"আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। নিউমোনিয়া চুলোয় যাক্, আমার কোনো অসুখই হয়নি!"

ফোন খানিকক্ষণ মৌন। বোধ হয় শচীনবাবু এত বেশী বিস্মিত হয়েছিলেন যে তাঁর আর কথা বলবার শক্তি ছিল না। তারপর 'রিসিভার' পুনর্ব্বার বহন করে নিয়ে এল শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর—"আপনার নিউমোনিয়া হয় নি!"

"উঁহু!"

—"কিন্তু চন্দ্রনাথও যে বললে, আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে!"

—"চন্দ্রবাবু বোধ হয় মনে করেন নিউমোনিয়া রোগটি তাঁর অনুগত ভৃত্য!"

—"মানে?"

—"ক্রমশ প্রকাশ পাবে।"

—"তাহ'লে আপনি শয্যাগত হয়ে আছেন কেন?"

—"ওটা মিথ্যা রটনা। আমি শত্রুদের ভোলাতে চেয়েছি।"

—"আঃ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম! তাহ'লে আপনি আসছেন?"

—"আমরা প্রস্তুত। আমি আর নারায়ণ। আমরা দলে বেশ ভারি হয়ে যাব তো?"

—"সে-কথা আর বলতে! চার নম্বরের বাড়ী থেকে আজ একটা ইঁদূরও বাইরে বেরুবার পথ পাবে না। আজই আমরা বুঝতে পারব, বড়বাবু আর ছোটবাবু এ দুই মহাত্মার আসল পরিচয় কি? তাহ'লে এখনি চ'লে আসুন। একটু আগে থাকতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছনো দরকার। নমস্কার!"

'রিসিভার'টা রেখে দিয়ে নরেন বললে, "জাগো নারায়ণ, যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন কর।"

নারায়ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'মিলিটারি' কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, "যথা আজ্ঞা, সেনাপতি!"

—"হ্যাঁ নারায়ণ, এইবারে রঙ্গমঞ্চের উপরে তুমিই হবে প্রধান অভিনেতা।"

—"কেন?"

—"কারণ আমার মস্তিষ্কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার হয়তো দরকার হবে তোমার বাহুবল!"

—"বাহু আমার বহুক্ষণ থেকেই তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।"

—"আদেশ তো পেলে। হে বীরবাহু, এখন অগ্রসর হও।"

ষষ্ঠ

অমাবস্যায়

অমাবস্যার রাত।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড অদৃশ্য হয়ে গেছে নিবিড় অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে।

অন্ধকারের সঙ্গে পাপের বন্ধুত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধুরা তাকে ভয় করে, কিন্তু পাপীরা খোঁজে অন্ধকারের আশ্রয়।

সেই ঝিল্লিমন্দ্রিত, জোনাকিখচিত অন্ধকারের ভিতরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে এক-একখানা গাড়ীর শব্দ। কোনো গাড়ীর শব্দ কাছে এসেই আবার দ্রুতবেগে চ'লে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনো গাড়ীর শব্দ যাচ্ছে হঠাৎ বন্ধ হয়ে। এখন চোখ দিয়ে কিছুই দেখা যায় না, ধ্বনি শুনে কাণ দিয়ে সব অনুমান ক'রে নিতে হয়।

রাত বারোটা বাজল। এইবারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে একখানা বাগানবাড়ীর মধ্যে। বাহির থেকে তার মধ্যে

কোনো জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই আমরা দেখতে পাব, মস্ত একখানা হল-ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে ব'সে আছে একদল লোক।

একদিকে রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো এবং আর একদিকে 'প্লাটফর্মে'র উপরে আছে একটি টেবিল ও ছুইখানা চেয়ার। 'প্লাটফর্মে'র উপরে ও নীচে কোনো চেয়ারই খালি নেই। এ যেন একটা সভার দৃশ্য - কিন্তু কোনো সভ্যেরই মুখ দেখবার যো নেই। প্রত্যেকেরই মুখের উপরে বিরাজ করছে একটা ক'রে কালো কাপড়ের মুখোস বা 'মাস্ক্'। ঘরের ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলছে একটি কেরোসিনের 'ল্যাম্প্', তার আলো এমন অপ্রচুর যে চারিদিকেই দেখা যায় আবছায়ার লীলা!

'প্লাটফর্মে'র উপরে যে ছু'জন লোক বসেছিল, তাদের একজন ফিস্‌ফিস্ করে আর একজনকে সম্বোধন ক'রে বললে, "ছোটবাবু, আজ আমাদের এখানে ক-জন সভ্য আসবার কথা ছিল মনে আছে ?"

—"মনে আছে বড়বাবু! তিরিশ জন।"

—"একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি ?

—"কি ব্যাপার ?"

—"আমরা ক-জন এখানে আছি একবার গুণে দেখ দেখি ?"

ছোটবাবু মনে মনে গণনা ক'রে সবিস্ময়ে বললে, "এখানে সভ্য তো দেখছি বত্রিশ জন!"

—"তাহ'লে এই বাড়তি সভ্য ছু'জন কেমন ক'রে এখানে এল ?"

ছোটবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

—"কিন্তু আমাদের বুঝতে হবেই। মাঝখানের দরজার কাছে ঐ যে দু'টি লোক ব'সে আছে, ওদের দেখে কি বুঝছ?"

—"দেখছি তো একজন ভয়ানক লম্বা-চওড়া, আর একজন হচ্ছে ভয়ানক বেঁটে আর রোগা!"

—"ওদের দেখে আমার কাদের মনে পড়ছে জানো? নর-নারায়ণকে!"

—"কিন্তু তা—তা কেমন ক'রে হবে বড়বাবু? আমরা তো সকলেই জানি, নরেন এখন 'নিউমোনিয়া' রোগে একেবারে শয্যা-গত হয়ে পড়েছে। আর তার বিছানার পাশে দিনরাত ব'সে আছে তার বন্ধু নারায়ণ।"

—"ধরলুম নর-নারায়ণের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব। তবে ওরা কে? ব্যাপারটা ভালো বোধ হচ্ছে না। ওদের পাশের ঘরে ধরে নিয়ে চল। আগে ওদের পরীক্ষা না ক'রে কোনো কাজই করা চলবে না।"

ছোটবাবু ইঙ্গিত ক'রে ডাকতেই দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে তাদের কাণে কাণে কি কথা বললে কিছুই শোনা গেল না। লোকদু'টো পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রথমেই সেই বৃহৎ মূর্ত্তিটির দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দু'দিক থেকে তার দুই হাত চেপে ধ'রে বললে, "তোমাকে একবার পাশের ঘরে যেতে হবে।"

অকস্মাৎ মূর্ত্তিটা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর ঝট্কান্

মেরে মুক্ত ক'রে নিলে নিজের হাত-দু'খানা। পরমুহূর্তে যারা তার হাত ধরেছিল, তারা দু'জনেই দূরে গিয়ে ঠিক্‌রে পড়ল।

ইতিমধ্যেই ছোটখাটো লোকটিও দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ-হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটা বাঁশী বার ক'রে খুব জোরে ফুঁ দিলে এবং ডান-হাত দিয়ে আর এক পকেট থেকে বার করলে রিভলভার। বড় মূর্ত্তিটিও আর একটি রিভলভার বার করতে দেরি করলে না।

সভার সকলেই বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমটা হতভম্বের মত হয়ে রইল।

তারপরেই বাহির থেকে জাগল কার উচ্চ সতর্কবাণী —"পালাও, পালাও! পুলিস!" সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো জুতো-পরা পায়ের দৌড়াদৌড়ির শব্দ।

তারপরই বেধে গেল মহাগোলমাল। সকলেই সভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে।

বড়বাবু ও ছোটবাবুও 'প্লাটফর্মে'র উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথা থেকে স্বয়ং শচীনবাবু এসেই বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন ছোটবাবুর কণ্ঠদেশ! বড়বাবু বিদ্যুৎ-বেগে অদৃশ্য হ'ল একটা দরজার ভিতর দিয়ে। নরেন ও নারায়ণ তখন টান মেরে নিজেদের মুখোস খুলে ফেলেছে। তারা ছুটল বড়বাবুর পিছনে পিছনে।

নরেন ও নারায়ণ বাইরের বারান্দায় এসে প'ড়েই দেখলে, বড়বাবু দৌড়ে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে দরজা। নারায়ণ ছুটে গিয়ে দরজার উপরে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগল। সে প্রচণ্ড আঘাত দরজার পাল্লা বেশীক্ষণ

সহ্য করতে পারলে না, খিল ভেঙে দড়াম্ ক'রে খুলে গেল। নরেন ও নারায়ণ অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজেদের 'টর্চ্চ' জ্বেলে ফেললে, কিন্তু ঘরের কোনোদিকে কেউ নেই!

এক কোণে ছিল ছোট একটা তক্তাপোষ। তাছাড়া ঘরের ভিতরে আর কোনো আসবাবই নেই। নারায়ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, "কি আশ্চর্য্য, লোকটা গেল কোথায়? ফুস-মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?"

নরেন বললে, "মানুষের দেহ কর্পূর দিয়ে গড়া নয়, আর কর্পূরও এত তাড়াতাড়ি উপে যেতে পারে না।"

—"তবে সে গেল কোথায়? আমরা যে স্বচক্ষে তাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছি! এ-ঘর থেকে তো বেরুবার আর কোনো পথ নেই!"

নরেন বললে, "ঐ তক্তাপোষখানা টেনে সরিয়ে আনো দেখি!"

নারায়ণ তক্তাপোষখানা হিড়্‌হিড়্ ক'রে একদিকে টেনে আনলে। তারপরেই দেখা গেল, তক্তাপোষের ঠিক তলায় মেঝের উপরে রয়েছে ছোট একটা কাঠের দরজা!

নরেন বললে, "বড়বাবু তক্তাপোষ সরিয়ে এই দরজা খুলে পাতাল-প্রবেশ করেছেন। ভিতরে নেমে দরজা বন্ধ করবার আগে তক্তাপোষখানা আবার যথাস্থানে টেনে এনে রেখেছেন। এইবারে আমাদেরও পাতাল-প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

ততক্ষণে শচীনবাবুও কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে ছুটে এসে বললেন, "এখানে আবার কি ব্যাপার?"

নারায়ণ বললে, 'দলের সর্দ্দার এই দরজার আড়ালে ব'সে বিশ্রাম করছে। দরজাটা ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন।"

পাহারাওয়ালারা খানিক্ষণ চেষ্টা করবার পরই দরজার পাল্লা দুইখানা খুলে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখা গেল কয়েকটা ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপ। তারপর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ সুড়ঙ্গের ভিতরে জাগল রিভলভারের গর্জ্জন এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা ভারি জিনিষের পতন-শব্দ। তারপর আবার সব চুপ্‌চাপ্‌!

শচীনবাবু বললেন, "এখন কি করা উচিত? লোকটা দেখছি সশস্ত্র।"

নরেন মাথা নাড়তে নাড়তে সহাস্যে বললে, "আমার বিশ্বাস, সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকলে এখন দেখতে পাওয়া যাবে বড়বাবুর মৃতদেহ। সে বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।"

নরেনের অনুমানই সত্য হ'ল। পাহারাওয়ালারা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বার ক'রে নিয়ে এলো একটা রক্তাক্ত দেহ।

কিন্তু সে তখনো মারা পড়েনি। নারায়ণ টান মারতেই তার মুখের আবরণ গেল স'রে।

শচীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "একি! এ যে ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ!"

নরেন হাস্যমুখে বললে, "চন্দ্রনাথকে চিনতে পেরেছেন দেখে খুসি হলুম। হ্যাঁ শচীনবাবু, এই চন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে সাজে পুলিসের

প্রিয় ডাক্তার, আর যবনিকার অন্তরালে ব'সে চালনা করে গুপ্তচরের এই বৃহৎ দলটি !"

শচীনবাবু তখনো বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারেন নি। হতভম্ব ভাবে বললেন, "চন্দ্রনাথ পঞ্চম-বাহিনীর সর্দ্দার !"

—"এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"অথচ এই চন্দ্রনাথ মুখের কথায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় শত্রু জাপানীদের আর কেউ নেই।"

—"আপনার মত পাকা পুলিসের চোখে যখন ধূলো দিয়েছে তখন চন্দ্রনাথকে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ব'লে স্বীকার করতেই হবে।"

নারায়ণ বললে, "কিন্তু চন্দ্রনাথ কেমন ক'রে জাপানীদের গুপ্তচর হ'ল ?"

নরেন বললে, "আমার বিশ্বাস চন্দ্রনাথ যখন বর্মায় ছিল তখনি সে এই সুযোগ পেয়েছিল। তারপর সাধারণ পলাতকের মতই আবার ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করেছে আর শত্রুদের টাকায় গ'ড়ে তুলেছে এই মস্ত গুপ্তচর-সমিতি।"

নরেনের একখানা হাত চেপে ধ'রে শচীনবাবু বললেন, "নরেনবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ ! আপনি না থাকলে চন্দ্রনাথ আজ ধরা পড়ত না।"

চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে দুই চোখ মেলে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। অতি মৃদু হাসি হেসে অস্পষ্ট স্বরে বললে, "কিন্তু তোমরা আমাকে ধ'রে রাখতে পারবে না। আমি এখনি তোমাদের ফাঁকি দেব।"

সে ফাঁকিই দিলে। মিনিট-দশেকের মধ্যেই তার মৃত্যু হ'ল।

কিন্তু তার দলের সকলেই ধরা পড়ল।

পরে জানা গেল, চন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো কয়েকজন বিপথগামী ভারতবাসীকে নিয়ে একখানা জাপানী সাবমেরিণ ব্রহ্মদেশ থেকে সমুদ্রপথে সুন্দরবন অঞ্চলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

তাদের বিভিন্ন আড্ডা খানাতল্লাস ক'রে পাওয়া গেল কাঁচের চুঙির ভিতরে সুরক্ষিত বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু, ভারতবর্ষের নানাদেশের বড় বড় মানচিত্র, অনেকরকম আগ্নেয়াস্ত্র আর বোমা ও ডিনামাইট এবং শত্রুপক্ষের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে বেতারযন্ত্র প্রভৃতি আরো অনেক জিনিষ।

নরেন বললে, "দেখ নারায়ণ, অপরাধীরা অতি-চালাক হ'লেও প্রায়ই ধরা পড়ে অতি-বোকামির জন্যে। চন্দ্রনাথের কাছে আরো কতরকম জীবাণু ছিল! কিন্তু সে যদি বারবার একই নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু ব্যবহার না করত, তাহ'লে আমাদের সন্দেহ এত-শীঘ্র তার উপরে গিয়ে পড়ত না!"

নারায়ণ সভয়ে মুখভঙ্গি ক'রে বললে, "বাপু! এ-অস্ত্রযুদ্ধ নয়, মল্লযুদ্ধ নয়, এ হচ্ছে জীবাণু-যুদ্ধ! এ সব বোঝবার মতন বুদ্ধি বা বিদ্যে আমার নেই!"

ইতি